JHARBATI

Gargi Bhattacharya

******

COPYRIGHTED
MATERIAL

ঝাড়বাতি

******

গার্গী ভট্টাচার্য

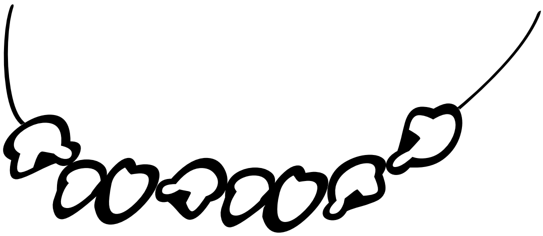

ডোনা , ঝুমুর , মুন্নাদিদি ও রিঙ্কুকে ---(শাশ্বতী, মহুয়া, সোমা ও গীতা)

ঝাড়বাতি

মোমশিখা বিদেশে এসেছে প্রায় ১৫ বছর ।

এখানে সে পুলিশ বিভাগে, শিল্পী হিসেবে কাজ করে ।

ভেনিসে, আর্ট নিয়ে পড়ে অন্য দেশে এসে থিতু হয়েছে । এই দেশে মাফিয়া রাজ চলে । সমান্তরাল সরকার চালায় মাফিয়ারা । দেশের নাম মালং । সম্প্রাতিক মাফিয়া রাজার নাম লুকিনো ।

এই মানুষটি পিসের নামে ভায়োলেন্স করে । অসংখ্য মানুষ মেরেছে মানে পিস করেছে ওর বিশেষ পিস মানে শান্তি আনতে গিয়ে ।

লোকটি এখন মৃত্যুদন্ড পেয়ে জেলে বন্দী ।

ছদ্মবেশ ধারণে অসম্ভব পটু এই মানুষটি কোনোদিন আইনের হাতে ধরা পড়েনি । এই যে এখন মৃত্যুর অপেক্ষায় জেলে আছে সেও স্বেচ্ছায় ধরা দিয়ে । চার চারটে দেশের পুলিশ পেছনে লেগে থেকেও কোনোদিন ধরতে সক্ষম হয়নি ।

শেষে নিজেই সারেন্ডার করে ।

লুকিনোর লুকানো অবয়ব এখন লোকসমক্ষে । প্রায় সাত ফিট্ লম্বা । চওড়া বুকের ছাতি । তাম্রবর্ণ । কালো চুল । অনেকটা রাহুল দেবের মতন দেখতে । বলিউডের ভিলেন । তুবড়ানো গাল , ঈষৎ ঝোলা মুখশ্রী ।

প্রথম দর্শনেই মোমশিখা বোল্ড আউট ।

এতবড় একজন দাগী আসামী কিন্তু দেখে বোঝার উপায় নেই ।

অবসর এখন অফুরন্ত তাই ওর সেলের দেওয়াল চিত্রার্পিত ।

বিভিন্ন মানুষের মুখ ও আকৃতি ।

সেই সুত্রেই মোমশিখা যাকে লোকে মোমো বলে ডাকে , একদিন ওর সেলে ঢুকে পড়ে । স্বল্প আলাপেই একেবারে অপরিচিত মানুষকে অতি আপন করে নিতে পারে ।

আর বিশ্বসংসার সম্পর্কে মানুষটির অসম্ভব জ্ঞান । বলেঃঃ দূর্বলদের সবসময়ই অত্যাচারিত হতে হয় । নিজের ভাগ নিজেকেই ছিনিয়ে নিতে হয় নাহলে অন্যরা পা দিয়ে মাড়িয়ে চলে যাবে । সবাই মনোবাসনা পূরণের জন্য এই জগতে আসে । কেউ সফল হয় কেউ হয়না । নিজের পাওনাগন্ডা নিজেকেই বুঝে নিতে হবে । কেউ হাতে তুলে দেবেনা ।

এরকম একটি ব্রিলিয়্যান্ট মিলিটারি মাইন্ড কী করে কুপথে চলে গেলো তাই নিয়ে ভাবার জন্য অন্য লোকেরা আছে । মোমশিখার মনে হয়েছে যে এর সন্তান সে গর্ভে ধারণ করে একটি সৎ ও ব্রিলিয়্যান্ট মিলিটারি মাইন্ড তৈরি করবে ।

জেলের অফিসারগণ মোমশিখাকে খুবই শ্রদ্ধাভক্তি করে । স্কেচে অসম্ভব পারদর্শিনী এই বাঙালী মেয়েটি ওদের সবার চোখের মণি । কাজেই বলা হল যে কয়েদী রাজি হলে এই কর্মটি সম্ভব । আর রাজি হলও লুকিনো । আর্টের মিল আছে দুজনের মাঝে । জেলের সেলেই হল প্রথম ও শেষ মিলন, এক দূর্ধর্ষ ক্রিমিন্যাল ও নরম সরম বাঙালী শিল্পী মোমশিখা দত্তের ।

পুলিশের নির্দেশে অচেনা মানুষের মুখ এঁকে, তাকে গ্রেফতার করতে সাহায্য করা মোমো এখন সেরকম এক মানুষের সাথে ফুলশয্যা পেতেছে ।

এতবড় কয়েদী, সাইজে ও কর্মে- কিন্তু একটা শর্ত দিয়েছিলো যে মেয়েটি যেন কোনো ব্যাক্তিগত প্রশ্ন না করে ।

করেনি মোমশিখা । স্বপ্ন সবার সফল হয়না । যখন হয় তখন অল্প স্বল্প কম্প্রোমাইজ করতে ক্ষতি কী ?

যেদিন মানুষটিকে চির-ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হল সেদিন নিজের অজান্তেই মোমোর নয়ণতারা, বৃষ্টিতে ভিজে যায় । **সেই বৃষ্টির**

ছোঁয়া লাগে গর্ভে । একদিন সে আসে । পুওর মিসগাইডেড্ জিনিয়াসের , জিনিয়াস চিহ্ন ! **MIRKO :** "the peaceful one".

বিদেশী স্কুলে না পড়িয়ে ; মোমো তাকে নিয়ে যায় সুদূর ভারতের একটি স্কুলে । যেখানে মানুষ তৈরি করা হয় , মেশিন নয় ।

জিড্ডূ কৃষ্ণমূর্তির, ঋষি ভ্যালি স্কুলে পড়ছে ওদের ছেলে মির্কো । **ওর, মানুষের ভালো করার ইচ্ছেকে**- ওর মা ও স্কুল শিক্ষা ওর দায়িত্ব বলে শেখাচ্ছে । **ওর বাবার মতন ফ্যানাটিক কিংবা অবসেসিভ না করে ।**

বন্ধুরা যখন জানতে চায় এই পুলিশকর্মীর কাছে যে মোমশিখার সন্তান ঝাড়বাতি হবার দিকে পা দিয়েছে তবুও তার জীবনে আর কী কী ইচ্ছে বাকি আছে , তখন অত্যন্ত নম্রভাবে মোমো বলে থাকে যে ওর ইচ্ছে ছিলো **মিসেস লুকিনো** হয়ে, বাঙালী নববধূর সাজে সজ্জিত হবে , আল্‌তা , সিঁদুর ইত্যাদি পরে - **মৃত্যুবরণ করার ইচ্ছে ছিলো সধবার বেশে কিন্তু সেই সাধ আর কোনোদিনই পূর্ণ হবেনা ।**

ঢেউ

মেলবোর্নের সমুদ্রপাড়ে, একাকিনী এক ভারতীয় মহিলা। তার নাম লীনা কাপুর। বিদেশী সবজি সংস্থায় অনেকদিন কাজ করেছে। পরে স্বামীর সাথে একটি ছোট ফার্ম কিনে, সেখানে চাষবাস করতো।

অর্গানিক সবজি চাষ হত সেখানে। সেই ফার্মের পেছনে একটি নদী ছিলো। নদীর সরু অংশ ক্ষেতের ভেতরে চলে আসে। দুই ছেলে সেখানে বসে বসে প্রায়ই মাছ ধরতো। শিশু দুটির শখ হয়ে দাঁড়ায়- **নিয়মিত মাছ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে খাওয়া।**

একদিন যীশু-অর্চনার সময় ; একজন তলিয়ে যায় নদীর জলে । দু-তিনদিন ধরে তাকে না পাওয়া গেলে সবাই মিলে পুরো ফার্ম চষে ফেলে । শেষকালে ওকে নদীতে পচাগলা অবস্থায় পাওয়া যায় ।

ওর মা, লীনাকে- কেউ এই সংবাদ দিতে না পেরে বলে যে ওকে পাওয়া যায়নি । ওরা গলন্ত দেহটি নিয়ে, মায়ের অজান্তে সৎকার করে আসে ।

লীনার স্বামী করণ ; ওদের ফার্ম বিক্রি করে দেয় । কিছুটা এই দুর্ঘটনার জন্য , কিছুটা স্মৃতির কারণে ।

ওরা এখন এক সমুদ্রপাড়ে বসবাস করে । ঢেউয়ের গর্জন নাকি ওদের ভালোলাগে । নীরবতা অসহ্য লাগে ।

ওদের বাড়ি, মোটা মোটা লোহার শিক্ দিয়ে ঘেরা । গেটে সর্বদাই তালা মারা থাকে । অন্য শিশুটিকে দেখাশোনা করার জন্য আয়া আছে । কারণ ওর মা লীনা, সকাল থেকে গভীর রাত অবধি সমুদ্র কিনারায় বসে থাকে ।

ভূগোলে পড়েছিলো যে নদী গিয়ে মেশে সমুদ্রে আর সমুদ্র সবকিছু ফিরিয়ে দেয় । তাই ছেলের ফিরে আসার আশায় দিন গুনছে । যদি নদীতে ডুবে গিয়ে থাকে তাহলে হয়ত নদী থেকে সে সমুদ্র হয়ে একদিন তার শুন্য কোলে ফিরে আসবে !

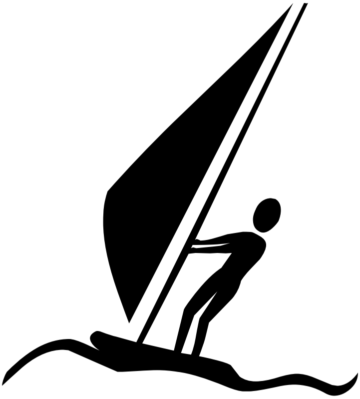

চাকু

সুকুমার মানুষ হয়েছে এক আধাশহরে । সেই শহরে আগে নবাব বংশ ছিলো । সুকুমারের বাবা নবকুমার- চাকু, ছুরির ব্যবসা করতো । ভদ্রলোকের দোকানে নানান নবাবী চাকুর দেখা মিলতো । মণিমুক্তো , পান্নাচুণী খচিত সেইসব ছুরির ইতিহাস ও ধার দুটৈ মনকাড়ার মতন । কিছু ছুরি ছিলো যা দিয়ে মানুষ খুন করা হয়েছিলো ।

অনেক ধনী মানুষ ও অন্যান্যরা ছুরি কিনে নিয়ে যেতো ।

নবকুমার বলতো ::: নিজেকে রক্ষা করার জন্য সবসময় একটা চাকু সাথে রাখা উচিৎ !

নেপালী কুক্রি নিয়ে ঘুরতো সে । সুকুমারের পরিবারের সবাই একটা করে চাকু নিয়ে ঘুরতো । বিয়ের পরে ওর স্ত্রী প্রীতিলতাকে বললো : চাকু বেছে নাও ! লতাপাতারা বাইরের জগতে খুবই সফট্ টার্গেট !

প্রীতিলতা কিন্তু চুপ করে থাকে ।

কিছুকাল পরে ; এক ভ্রষ্ট পথচারী ওকে রেপ করতে উদ্যত হলে ভীষণভাবে জখম হয় লতার হাতে ।

লতা- ওর দেহের বিশেষ বিশেষ সফট্ অংশে, নানান রণকৌশলে মেরে - ঘায়েল করেছিলো ।

--ইচ্ছে করলে মেরেও ফেলতে পারতাম কিন্তু আইন নিজ হাতে নিতে চাইনা ।

কুস্তিগীর বাবার কাছে শেখা । বিপদে পড়লে মেয়েরা যাতে লতার মতন নুইয়ে না পড়ে তার জন্য এইসব শিক্ষাদান ।

চোখ খুবলে নেওয়া , গলায় কিল মেরে শ্বাস নালি ভেঙে দেওয়া ইত্যাদি প্রীতিলতা ও তার অন্যান্য বোন আইভিলতা , মাধবীলতা আর বনলতার কাছে ছেলেখেলা ।

কথায় বলে, নামে কী আসে যায় ?

দেখা যাচ্ছে লোকমুখে ফেরা এই বচন- বাস্তবেও দাগ কাটছে । **লতা পরিণত হচ্ছে লৌহ-লতা বা শৃঙ্খলে ! মূর্খ রেপিস্টের হাতে ।**

মুগ্ধা

কাঠগোলাপ ঝরে পড়ছে ফুলগাছ থেকে । একটাই বড় গাছ গেটের পাশে । আর আছে বেগুনি ফুলের ঝাড় ।

এই হাসপাতালের রেস্তোরাঁ- মুগ্ধা রঙ্গরাজের ভ্রমণের জায়গা । নাহ্ ! মেডিক্যাল টুরিজম্ নয় এখানে খাবার খেতে আসে মুগ্ধা । চিররুগ্না এই নারীর বয়স এখন মধ্য চল্লিশ ।

জরায়ু বাদ গিয়েছে অসুখের আঁচড়ে । নেই ডিম্বাশয় কিংবা গর্ভনালী । শুধু দেহটি মেয়েদের মতন ওর ।

তবুও বুকে উথাল পাতাল রোমান্স আছে ।

ওর স্বামী ওকে ক্ষেপায় :: তোমার সব রোমান্স এখন কেবল আমার জন্য বুক্ড্ । আর চিটিং এর ভয় করিনা কারণ তোমাকে আর কেউ নেবেনা ।

মুগ্ধা এই হাসপাতালে এক সার্জেনের জন্য আসে । ভদ্রলোকের বয়স জেনেছে সত্তরের ওপর । এখনও অপারেশান করেন এবং নিঁখুত । কথা কম কাজ বেশি --করেন । অবিবাহিত ।

মালয়লি মানুষ। চোখে পুরু চশমা। ফ্রেঞ্চকাট দাঁড়ি - মেটে রং এর মানুষ। গলার স্বর বাজের মতন।

যখন মুখ খোলেন তখন জ্ঞান আর বাজ একই সঙ্গে পড়ে।

আগে দেখেছিলো যে এই ভদ্রলোক হাসপাতালের গার্বেজ বিন সাফ করছেন। দেখে ভেবেছিলো যে নিচুতলার কর্মী।

পরে একদিন দেখে যে লোকটি চিকিৎসকদের জন্য রাখা কফি মেশিন থেকে কফি বানিয়ে ওদেরই কাপে কফি পান করছে।

একটু বিরক্তই হয় মুগ্ধা , লোকটির স্পর্ধা দেখে।

দেরিতে হলেও জানতে পারে যে উনিই ওদের সার্জারি বিভাগের চেয়ার ও হেড।

মুগ্ধা, মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে এখন। যখন বৃষ্টি নামে তখন বুঝি মাটির সোঁদা গন্ধে ঠিক এমনটাই হয়।

বন্ধুরা ওকে পাগলিনী বলে। ও কড়া গলায় জবাব দেয় :: শ্রীরাধিকা আর কৃষ্ণের কোনোদিন বিয়ে হয়েছিলো ? তাতে কি ওদের প্রেমে শুধু মরুতাপ ছিলো ? মরীচিকা মনে হলেও তাতে যথেষ্ট সজীব জলরেখা ছিলো , ছিলো কোমল উষ্ণতা। রোমান্টিক স্পন্দন।

মুগ্ধতা অন্যদিকেও ; তাই তো প্রতিদিন সায়াহ্নে, কাজ থেকে ফেরার পথে এই হাসপাতালের প্যান্ট্রিতে খেয়ে যায় । স্বামী ভাবে চিররুগ্না স্ত্রী হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর ডায়েট খেয়ে সুস্থ হতে ইচ্ছুক ।

সন্ধ্যা গাঢ় হলে ; ছায়া গ্রাস করে রুম নম্বর সিক্স সিক্স ওয়ান । এক বৃদ্ধ , ঘরের সমস্ত বাতি নিভিয়ে দিয়ে বসে থাকেন । প্যান্ট্রির দিকে মুখ করে !

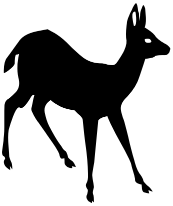

ভালোমানুষের পো

মমতা ঘোষের, মায়া মমতার কোনো অভাব নেই ।

বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান হলেও সে হিংসুটে নয় । শৈশব থেকেই রাস্তার কুকুরকে খাবার দেওয়া , পাখিদের দানাপানি খাওয়ানো ইত্যাদিতে সে অভ্যস্থ ।

এখন বিদেশে থাকে । দেশের নাম ওলিম্ ।

এখানে সে এসেছিলো বটানি নিয়ে পড়তে । গবেষণা হয়ে গেলেও উপযুক্ত চাকরি না পাওয়ায় সে বড় বড় শপিং মলে ঘুরে ঘুরে, দোকান থেকে ওদের গার্বেজ ব্যাগ নিয়ে বড় একটা গার্বেজ বিন থাকে শহরের একদিকে , সেখানে ফেলে দিয়ে আসতো । বদলে পয়সা পেতো ভালই । একার চলে যেতো ।

এই ছোট্ট শহরে সবুজ মানে গ্রিন ময়লা নেবার জন্য কেউ আসেনা । সপ্তাহে দুবার মাত্র শপিং মলের বিন পরিস্কার করতে লোক আসে গাড়ি নিয়ে তাই মমতার মমতাময়ী ভাব অর্থাৎ রোজকার ময়লা রোজ তুলে নিয়ে যাওয়াতে দোকানদারেরা বিশেষ করে কাফের মালিকেরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচতো ।

ড: মমতা ঘোষ সাতদিনই কাজ করতো । অন্যসময় ওর ল্যান্ডলেডির সাথে গল্প করে কাটাতো ।

ওদের পড়শী মহিলার বয়স প্রায় নব্বই-একশো । সন্তানেরা যথেষ্ট বয়স্ক । দেখার কেউ নেই । খ্রিস্টমাসে কেউ খবর নেওয়া দূরে থাকুক একটি কার্ড দেওয়া বা ফোন করা সেটাও করেনা ।

মহিলা একা একা সারাটা দিন বাইরে বসে বকবক করে ।

শাপ-শাপান্ত আর বাপ্ বাপান্ত করে সবাইকে ।

মমতাকে ডার্টি গার্ল বলে ডাকে । কারণ সে সাফাই এর কাজ করে এখন । আগেও বটানির গুঁতো খেয়ে বনেবাদারে যেতে হত । **মজার ব্যাপার হল ও যেই সাবার্বে থাকে তার নামও বটানি ।**

একদিন হঠাৎ শ্বাসবন্ধ হয়ে মারা গেলো পড়শী, মিসেস ট্যাগোরে । হ্যাঁ , রবীন্দ্রনাথ টেগোর নয় লুডা ট্যাগোরে ।

পরে জানা গেলো- মিসেস ট্যাগোরে তার বিশাল বাগান ও বারান্দা সমেৎ পুরো বাড়িটা, মমতাকে দান করে দিয়ে গেছেন কারণ ওর মনে হয়েছে- যেই মেয়ে ওদের দেশকে সাফ রাখতে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে সেই মেয়েই একমাত্র পারবে তার অবর্তমানে ওর স্বামীর তৈরি এই শখের বাগিচা ও মহল ; পরিস্কার পরিছন্ন ও সুন্দর করে রাখতে । **ওর অপোগন্ড সন্তানেরা, যারা কেবল মানি মানি মানি করে** আর নাতিনাতনিরা- এই বাড়ি পাবার যোগ্য নয় একেবারেই ।

পেস্ট কন্ট্রোল

বিদেশে আসার সময় পোষা কুকুর ডিজেলকে একটি কেনেলে দিয়ে এসেছিলো বরখা আর সমীরণ সিংহ ।

পোষ্য জিনিস দূরে চলে গেলে অসম্ভব কষ্ট হয় । ওরা তো নিজেদের বাচ্চার মতনই !

অনেকদিন বরখার বুকে যন্ত্রণা হত । নিজের একটা বাচ্চা চলে গেলে যেমন লাগে ঠিক সেরকমই কষ্ট হত ।

সমীরণের বুকে মুখ দিয়ে কত কেঁদেছে !

সমীরণ ওকে বলেছে যে কিছু পেতে গেলে কিছু ছাড়তে হয় । তবুও মন মানেনি ।

ছোট্ট জীবটির বুকে কত্তো কষ্ট হয়েছে ওরা বুঝেছিলো । ওর চোখ থেকে জল পড়ছিলো । ও চীৎকার করে কাঁদছিলো ।

বরখাও চেঁচিয়ে উঠেছে , হি নিউ ইট , নিউ ইট !!

ইদানিং বরখার বাড়িতে পোকামাকড়ের উপদ্রব শুরু হয়েছে । গরমকালে বেশি হয় । শীতকালে প্রায় দেখাই যায়না ওদের !

প্রতিদিন কাজ থেকে ফিরে একটা না একটা কিছু মরে পড়ে থাকতে দেখতো । ভাবতো নিজে থেকে মরে গেছে । ফ্রিকুয়েন্সি বেশি হলে ভাবতো যে কোনো রহস্যজনক কারণে মরে যাচ্ছে ।

পরে দেখলো যে বিছে , সাপ এমনকি বড় বড় ইঁদুরও মরে পড়ে থাকছে ।

একদিন ডিজেলের প্রিয় ইলিশ মাছের কাঁটা, বিনের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলো । সেই বিনে অসম্ভব আওয়াজ শুরু হয় যেন কেউ টেনে হিঁচড়ে ওগুলি বার করছে । কিন্তু কোনো কাঁটা কিংবা মাছের টুকরো পড়ে নেই ।

একদিন কেন, কয়েকদিন পরপর- সন্ধ্যাবেলা কার যেন ছায়া দরজার পাশ থেকে সরে গেলো । সাদা মতন কিছু একটা , একটু কুয়াশার মতন আর কালো দুটি টানা টানা উজ্জ্বল চোখ ।

একবার রাস্তায় খুব কুয়াশা ছিলো । গাড়ি চালানোতে সমস্যা হচ্ছিলো । ফগ লাইট ফাইটে কোনো সুবিধে হচ্ছিলো না ।

তখন ওরা দেখলো যেন কুয়াশা থেকে বেরিয়ে এলো এক সাদা ধোঁয়া । একটি আকৃতি নিয়ে ছুটে চললো রাস্তার মাঝখান দিয়ে । ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একটি পশুর মতন ছোট্ট চেতনা !

ওদের প্রিয় কুকুর ডিজেল -সাদা বা রূপার মতন চকচকে লোমওয়ালা ,তাজা এক জাপানী স্পিৎজ ছিলো । যে খেলতো আর নানানভাবে পোজ দিতে পছন্দ করতো ।

লেখিকার ব্যাক্তিগত জীবনের ঘটনা ।

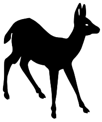

ইন্কাম্ ট্যাক্স অফিসার

ঘুষ নিয়ে নিয়ে ধনী হওয়া অফিসার ; ঘুষব্রত ঘোষ এখন বিদেশে থিতু হয়েছে।

আসলে হঠাৎ একদিন ওর বাসায় রেড্ হয় । প্রচুর ধনসম্পদ মেলে ওর দেওয়ালের লুকানো কুঠুরি থেকে । কোর্টে ওকে বলা হয় যে এত অর্থ যা ওর আয়ের সাথে ম্যাচ করেনা সেই অর্থ সে কোথায় পেলো ? **ঘুষব্রত চুপ করেই থাকে ।**

আইনের মানুষ, জনসাধারণের হিতে বলেন ::: যদি মেনে নাও যে এগুলি তোমার স্ত্রী আর তুমি পর্ণগ্রাফি চালিয়ে/দেখিয়ে পেয়েছো তাহলে একটা লজিক পাওয়া যাবে, আয়ের এই আজব পরিমানের । তোমাকে মুক্তি দেওয়া হবে ।

লজ্জার মাথা খেয়ে ঘুষব্রত স্বীকার করে নেয় যে এই অর্থ তার কাছে হার্ড ও সফট্ পর্ণো করেই এসেছে ।

কোর্টের রায় বেরোনোর পরে লোকে ছিঃ ছিঃ করলেও ওর স্ত্রী অসম্ভব চটে যায়, এই মিথ্যে বোঝা তার স্কন্ধে চাপানোর জন্য । **তবে মগজ বটে ঘুষব্রত ঘোষের ।**

সমস্ত টাকা নিয়ে চলে আসে বিদেশে । এখানে নবজীবন শুরু করে । এই দেশে বেশ্যাবৃত্তি লিগাল । কাজেই ওর কোনই সমস্যা হয়নি । স্কুবা ডাইভিং আর বাঞ্জি জাম্পিং করে দিন কাটায় ।

বহাল তবিয়তে আছে উপস্থিত ও বাস্তব বুদ্ধির জোরে ।

ভ্রমণ

সম্প্রতি বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ঘুরে গেছে আলিয়া খাতুন ।

পরবাসে জন্ম ও বড় হওয়া । যুবতী হলে ; নিজ দেশে ঘুরে যায় । বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে যেন খুঁজে পেয়েছে নিজেকে । প্রবাসে কত সুখে আছে ওরা !

এশিয়ায় জল, স্থল আর অন্যান্য বেসিক জিনিস নিয়ে মারমার কাটকাট । এক শহরে, খোলা তরবারি নিয়ে আলা হো আকবর স্লোগান দিতে দিতে ছুটে যাচ্ছে কিছু পথভ্রষ্ট মানুষ ।

ফিরে এসে বসের বকা শুনেও মিষ্টি হাসে । ফাস্ট ফুড জয়েন্টে গিয়ে অর্ডার দিলে, ওরা যদি ভুল করে তিনটে চিজের বদলে দুটো দিয়ে দেয় কিংবা বার্গারে এক্সট্রা স্পিনিচ্ ও মাশরুমের বদলে টমেটো ও লেটুস্ দিয়ে দেয়, আলিয়া একেবারে রাগে না । বরং মৃদু হেসে সাহেবি কায়দায় বলে ওঠে :: নো ওয়ারিজ্ ।

প্রবাসে সত্যি ওরা কত সুখে আছে !!

বুলেট প্রুফ

বিশ্বসুন্দরী ও লোকপ্রিয় নায়িকাদের যারা স্টকার্ তাদের শায়েস্তা করার এক অভিনব কৌশল আবিষ্কার করেছেন মিস্টার ফাউস্ত ব্রেভি ।

সত্যি বেশ ব্রেভ উনি । এমন এক যন্ত্র উনি বার করেছেন যার বোতাম টিপে দিলেই নিজে থেকে রূপসী মেয়েরা নকল পুরুষাঙ্গ বার করে পুরুষ হয়ে যাবে আর ওদের স্তন তখন বিভাজিকার শোভা না বৃদ্ধি করে চেস্ট ওয়ালে ঢুকে পড়বে ।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি !!

কিন্তু ঘটনা হল এই যে বেশিরভাগ রূপসীই এই যন্ত্রের বিরুদ্ধে । কারণ তারা স্টকিং পছন্দ করে । ওদের জন্য কতনা মানুষের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয় । ওরা মারা গেলে লোকে আত্মহত্যা করে । ওদের নকল করে চুল কাটে । স্নো পাওডার মাখে !

কাজে কাজেই পাপারাৎজির মতন স্টকারদেরও স্বাগত জানায় কোনো বাছবিচার না করেই । **আসলে ওরা প্যাম্পারড্ আর প্যাপড্ হতেই চায় ।**

(Note—Papped -- informal): take a photograph of a celebrity without permission, get photographed by paparazzi)

শিশু

অত্যন্ত সাহসী সেনা অফিসার- যিনি একাই অরুণাচলের সীমান্তে চীনা সৈনিকদের অত্যাচার বন্ধ করেছেন তিনি ছুটিতে গ্রামে এসেছেন ।

চৈনিক সৈনিকরা ; বর্ডার পার করে ঢুকে প্যাগোডার বুদ্ধ মূর্তি ভেঙে দিচ্ছে , মেয়েদের ধরে নিয়ে রেপ করছে ।

এই বাঙালী অফিসারটি অতি বলবান ও বুদ্ধিমান ।

কোনো যুদ্ধে না গিয়ে, চৈনিক ধরে ধরে ববিটাইজ করে দিয়েছেন ....যারা রেপ করতে অভ্যস্থ ছিলো ।

আর যারা বুদ্ধ মূর্তিতে প্রস্রাব করেছে- তাদের দুই হাতের বুড়ো আঙুল কেটে দিয়েছেন । কারো কিছুই বলার নেই । যুদ্ধ করেন নি কোনো ।

ছুটি শেষে জলপাইগুঁড়ির বাড়ি থেকে, বোচ্কা পিঠে নিয়ে ট্রেনে চড়তে উদ্যত হলে, তার মা এগিয়ে গিয়ে গার্ডসাহেবকে বলে ওঠেন ::: **বাচ্চাটা আসামের দিকে যাচ্ছে । যাত্রাপথে ওকে দেখবেন একটু । ঠিকমতন নামে যেন । ছেলেমানুষ কিনা ; বড় চিন্তায় থাকি পৌঁছ সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত ।**

জিহ্বা

সবাইকে দাঁতের আগায় রাখা ব্যাঙ্ক অফিসার টুটুল মুখোপাধ্যায় একজন নিয়মিত বক্তা । এত কথা বলে ও বলতে ভালোবাসে যে বলার নয় । নিজের গলা নিয়ে খুবই গর্ব তার! দারুণ আবৃত্তি করে । বিশেষ করে নজরুলের কবিতা ।

ব্রাহ্মণ সন্তান টুটুলের- এঁঠোকাঁঠা বিচার ভালই । টয়লেটে গেলে পোশাক ছেড়ে , চটি খুলে যায় । স্নান করে বেরোয় । বাইরে শুকোতে দেওয়া জামাকাপড় ; লাঠি দিয়ে তুলে স্নানঘরে নিয়ে যায় । শুদ্ধতা হারানোর ভয়ে । একেবারে বাতিকগ্রস্ত ।

এইসব ওর মায়ের কাছ থেকে শেখা । বন্ধুমহলে অবশ্য বলে থাকে যে জার্মসের ভয়ে এগুলো করা । হাইজিন , সায়েন্স ।

ইদানিং ; এই বখাটে মানুষটির জীভ কাটা পড়েছে, তার glossectomy করা হয়েছে ।কারণ পায়ু থেকে (মলদ্বার) ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়েছিলো মুখের ভেতরে । গাল ও জিহ্বাও বাদ যায়নি পায়ুতন্ত্রের অশুদ্ধতা থেকে । **বিশুদ্ধ মানুষ এখন পোশাক পরেই হাল্কা হতে যায় ।**

মার্টিন লেভিন

মার্টিন একজন ব্যস্ত অফিসার। সকাল ছটা থেকে রাত আটটা অবধি অফিসে কাজ করে। শনিবারেও কাজে যায়। কেবল রবিবারটা ছুটি।

লোকটি আগে খুব কাফে থেকে কিনে খেতো। বিকেল পৌনে পাঁচটাতে- কাফের সব খাবার শেষ করার জন্য ফ্রিতে দিয়ে দেয়। বিদেশে বাসি খাবার বিক্রি --সাধারণতঃ হয়না।

মার্টিন বেশিরভাগটাই নিয়ে যেতো। ওর সারাদিনের খাবার মনে হয় ও কাফে থেকেই নিতো।

যা বেঁচে যাবে তা নেবার জন্য আছে মার্টিন লেভিন।

এখন দিনকাল পাল্টে গেছে। এখনও পৌনে পাঁচটায়, ফ্রিতে খাবারগুলো দিয়ে দেয় কিন্তু মার্টিন এখন সকালে বাড়িতে খেয়ে আসে আর টিফিন নিয়ে আসে। খাঁটি ইংরেজ সাহেবের সন্তান মার্টিন টিফিনে আনে লেমন রাইস, কার্ড রাইস, বিসিবেলি ভাত, পোঙ্গল, সম্বর ভাত, রসম্ রাইস ইত্যাদি নানান প্রকারের রাইস। কারণ ওর বর্তমান স্ত্রী একজন দক্ষিণী।

দ্রাবিড় সুন্দরীকে দেখতে হেমা মালিনীর মতন ; নামও তার হেমা । সে এসে নাকি মার্টিনের জীবনই বদলে দিয়েছে । আগের বৌ কোনো গৃহকর্ম বিশেষ করে রান্না করতো না । দোকান থেকে স্যালাড্ , রোস্ট , বার্গার কিনে এনে ওরা খেতো ।

এখন হেমার কল্যাণে সব বদলে গেছে ।

নিউট্রিশাস্ সমস্ত খাবার খায় ওরা । অল্প ওয়াইন আর কফির নাকি অনেক উপকারিতা । গ্রিন-টি আর সবজি ও রংবেরং এর স্যালাড্ খেতে অভ্যস্ত । ফ্রুট জুস্ না পান করে নির্মল জলপানে অভ্যস্ত হয়েছে মার্টিন । আর অজস্র ফল খায় । বিশেষ করে আপেল আর ব্লু- বেরি ।

হেমা ; আরো আরেকটি দিকে ওকে সমৃদ্ধ করেছে ।

আগে ওর বাজে খরচের হাত ছিলো । মাইনে পেলেই সব উড়িয়ে দিতো । এখন টাকা জমিয়ে ও অন্য একটা বাড়ি কিনেছে , শহরতলিতে । থ্রি- বেডরুম ফ্ল্যাট । পেছনে বড় বাগান ।

আর ওরা- বছরে একবার দেশের মধ্যে আর আরেকবার বিদেশে অর্থাৎ ইস্টার ও খ্রীস্টমাসে রীতিমতন লম্বা ছুটি নিয়ে বেড়িয়ে বেড়াতে সক্ষম । **সবই- হেমার ইকোনমিক্যাল ও ইকোলজিক্যাল**

স্বভাবের জন্য । বৌকে মনে হয় একটু বেশি ভালোবাসে । সম্প্রতি বিবাহবার্ষিকীর জন্য একটা সুন্দর বৈদূর্য্যমণি কিনেছে । অফিসে সবাইকে দেখাচ্ছে মার্টিন । সবাই দেখছে- পরশমণির জন্য কেনা মহার্ঘ্য মণিটি, নয়নমণি দিয়ে ।

মেঘা

মেঘার মুখে মেঘ জমেছে । বিদেশে পড়তে আসা দিল্লীর মেয়েটি ক্রমাগত আক্রান্ত হয়েছে চুরি ইত্যাদিতে ।

ঘরের ভেতর থেকে চুরি গিয়েছে সমস্ত । বিশেষ করে টাকাপয়সা । ক্যাশ টাকা বেশি গেছে দামি বস্তুর থেকে ।

মেঘার রুমমেট এক থাইল্যান্ডের মেয়ে । মেয়েটি খুবই ভদ্রসভ্য ও সৎ । ওর বাবা ও মা এসেও দেখা করে গেছে এইদেশে , মেয়ের সাথে । কাজেই সে যে দুনম্বরী আর এগুলো করবে না বেশ বোঝা যায় । **কিন্তু পুলিশও ক্লু পাচ্ছে না** । ভাঙাচোরা অথবা ধস্তাধস্তির কোনো চিহ্ন নেই । কে করছে আর কেন- ওরা বুঝতে অক্ষম ।

শেষমেষ ওদের ক্লাসেরই এক ছেলে, নাম তার অলিভার সে পরামর্শ দিলো --**ক্যামেরা লাগিয়ে রাখতে** । কম্পিউটারে বিশেষ ক্যামেরা লাগিয়ে দেখা গেলো যে ওরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে ওদের ল্যান্ডলর্ড ; ফায়ারপ্লেসের পাশে- এক গুপ্ত পথ দিয়ে ঘরে ঢোকে ।

রাস্তাটা অভিনব । এমনি বন্ধই থাকে । অর্থাৎ চিম্‌নির ইটের পাইপ বেয়ে অদ্ভুতভাবে ঢোকে । দোতলা থেকে । লোকটি আদতে ড্রাগ্‌স্‌ নেয় নিয়মিত । তাই পয়সা লাগে অথচ কাজ করেনা কোনো । বাড়িভাড়া দিয়ে চলে । **একা মানুষ । অতএব ।**

সত্য ঘটনা । লেখিকার বান্ধবীর গল্প ।

ছিনতাই

কংস করকরান সাহেব হলেও ; আধাসাহেব । মা দক্ষিণী আর বাবা সাহেব । কংসের গায়ের রং মায়ের মতন বাদামি ।

লোকটি, এক সংস্থায় বাড়ি তৈরির সমস্ত জিনিস সাপ্লাই দেয় ।

একদিন দুপুরে বাড়িতে খেতে আসছিলো । একটু দূরে বাড়ি । মিনিট কুড়ি লাগে লোকাল ট্রেনে । বাড়ি গিয়ে লাঞ্চ খেয়ে আবার কাজে আসে । খুব ভোর থেকে কাজ করে ।

বলে :: আমরা তো রিচার্ড ব্র্যান্সান্ নই কাজেই বিল দেবার জন্য সারাটা জীবন গাধার খাটনি খাটতে হবে । তবে ভাবছি ভালো করে জমিয়ে নেবো । এখন কিপ্‌টেমি করি । সস্তার জিনিস কিনি । তাহলে মোটামুটি মধ্যবয়সে অবসর নিতে পারবো আর বাকি জীবনটা লাইব্রেরিতে বসে কাটাবো । কত কিছু জানা যায় বলতো বই পড়ে , ভিডিও দেখে !

একদিন দুপুরে ঘুঘু ডাকছে । লেকের পাশে রেল স্টেশান ।

রেলের ডিব্বাগুলি ছোট ছোট । লোকাল ট্রেন । যাত্রী সংখ্যা অনেক কম । বিশেষ করে দুপুরে ও রাতে ।

কংস করকরান নেমে, দ্রুতপায়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলো । এমনসময় এক এশিয়ার মানুষ এগিয়ে এসে চাকু বার করে বলে

::: **যা আছে সব দিয়ে দিন নাহলে প্রাণ যাবে ।**

কংসর কাছে সেরকম কিছু ছিলো না । আংটি আর ঘড়ি বাদ দিলে কিছু কড়কড়ে ডলারের নোট, ব্যস্ । দিয়ে দিলো সবই ।

পরে ছিনতাইকারিকে একপাশে টেনে নিয়ে প্রশ্ন করে-- **তুমিও এশিয়ার আর আমিও । বিদেশে এসে এসব করছো কেন ?**

এতদূরে এসেও যদি এসবই করবে তাহলে এখানে এলে কেন ?

এবার ছেলেটির চোখে, জলের ধারা । **কপল ভিজিয়া গেলো নয়ণের জলে** । ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে এসেছিলো । এখন বেকার । এইদেশে এখন অনেক বেকার । বেকারত্বের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ছিনতাই শুরু করেছে । কারণ তৃতীয় বিশ্বে ফিরতে চায়না । থার্ড ওয়ার্ল্ডে ফিরে যাবার থেকে প্রথম বিশ্বের জেল খাটা অনেক ভালো । কাজেই সে এখন পাকা ঠগ্বাজ হয়ে উঠেছে ।

কংসকে লোকে এখানে কন্স্ বলে । নাম যাইহোক স্বভাবে সে খুবই নরম ,কোমল । কাজেই এক্সট্রা কিছু কড়কড়ে নোট বার করে ছেলেটিকে দেয় । নেমকার্ড দিয়ে বলে দেখা করতে ।

ছেলেটি অবাক হয় । দেখাও করে অবশ্য । কংস ওর কোম্পানিতে বলে কয়ে ছেলেটিকে চাকরি দেয় । কারিগরি বিদ্যা সংক্রান্ত কিছু নয় অবশ্য । মালপত্র লোডিং আর আনলোডিং করতে হবে ক্লায়েন্টের কাছে গিয়ে ।

ও রাজি হয় । হাতে স্বর্গ পায় ।

কংসর নামটা নিয়ে পরে একটা ছোট্ট মন্তব্য করে :: আপনার নামই তো হওয়া উচিৎ কিষন্ কে কংস রাখলো ?

---আমার বাবা তো সাহেব, তাই উনি জানতেন না যে কংস আদতে কে । চরিত্র জানতেন না কিন্তু নামটা ওঁর ভালোলাগে । যখন জানতে পারেন তখন আর বদলান নি ।

তখন তো ফেসবুক ছিলো না তাই কেউ হ্যারাস্ও করেনি বাবা-মাকে -সঈফ আলি খান ও করিনার মতন ।

<u>সত্য ঘটনা জাত গল্প ।</u>

অলকাতিলকা

অলকাতিলকা ; লাক্ষ্মৌ শহর থেকে গবেষণা করে বিদেশে আসে বিয়ের পরে । স্বামী প্রযতের দুটি চাহিদা ছিলো । **লম্বা মেয়ে আর পি এইচ ডি ।**

অলকা, বিদেশে আরো গবেষণার সুযোগ পাবে ভেবে চলে আসে । বরের একটা শর্ত, মনে ছিলো না ।

বিয়ের পরে বৌ চাকরি করবে না । ঘরে থাকবে ।

ও যেই দেশে এসেছে, সেখানে মেয়েরা আগে মানে বছর ২৫ আগেও নাকি বিয়ের পরে চাকরি ছেড়ে দিতো । ওয়ার্ক প্লেস রোমান্স হয়ে গেলেও চাকরি ছেড়ে দিতো ।

কাজেই প্রযতের চাহিদাকেও অন্যায় বলা যায়না ।

আর বাড়িতে একজন গার্ডিয়ান না থাকলে ছেলেমেয়েরা মানুষ হবেনা । প্রযত বললো ::: **যদি তুমি কাজ করো আমি অবসর নেবো ।** অতএব অলকাতিলকা কাজ করলো না কোনোদিনও ।

শিশুদের চেয়ারের সাথে বেঁধে রেখে দোকান বাজারে যেতো ।

প্রযত অনেকটা সময় অন্যান্য শহরে থাকতো কাজের কারণে ।

আগে দিনে মোট ৬০০র বেশি কিলোমিটার ড্রাইভ করে কাজে যেতো আসতো । পরে অন্য শহরে চলে যায় ।

অলকা চাকরি করেনি বটে তবে এখন কম্পিউটারে বসে প্রাইভেট টিচিং দেয় । ছেলেমেয়রা বড় হয়ে গেছে তার । শিক্ষাদানের জন্য ; অনেক পিছিয়ে পড়া দেশের উদ্যোগী ছাত্রছাত্রীরা অনেক কিছু জানতে পারে , শেখে ।

পয়সাও নেয় তবে কম । কারণ বিদ্যা ওর কাছে পয়সা রোজগারের রাস্তা নয় । অবসরে বিভিন্ন সার্ভে করে । অনলাইন সার্ভে । সেখান থেকে আয় করে এখন বেশ স্বচ্ছল ।

প্রযত বলে :: তুমি চাকরি না করেও আমার রোজগেরে গিন্নী ।

অলকাতিলকা মিষ্টি হেসে বলে :: চাকরি না করলে কি? আমি ছেলেমেয়েদের ভালোভাবে মানুষ করে দিয়েছি । বিদেশের সমাজে বড় হয়েও ওরা বিদেশের খারাপ জিনিসগুলো আত্মস্থ করেনি । হয়ত ওরা কেউ বিল গেটস্ কিংবা রবিশঙ্কর নয় কিন্তু মানুষ হিসেবে একদম প্রথম সারিতে আসবে ।

কথা বলার ভঙ্গিমায় যেন গোপন ব্যথা লুকিয়ে ছিলো । হয়ত আবেগ লুকানোর জন্যই তাড়াতাড়ি কিচেনে পা বাড়ায় প্রযতের পছন্দের লম্বা মেয়ে , **মৃত স্কলার- ডঃ অলকাতিলকা** ।

বলরামের রোহিনীর মতন , যার মাথায় বাড়ি মেরে নিজের সাইজে করে নিতে পেরেছে সে ।

তীর ভাঙা ঢেউ

বালাগুরুস্বামীকে দেখতে সুন্দর । রূপবাণ । আমাদের রোজা সিনেমার নায়কের মতন দেখতে । পরবাসে সে মাইনিং ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে । দূরের খনি শহরে থাকে । মাসে একবার বাড়ি আসে ।

দুই সন্তানকে নিয়ে ওর স্ত্রী সুজাতা বসবাস করে অন্য একটি শহরে । সুজাতা একটি অ্যান্টিক শপের ম্যানেজার ।

অনেক মূল্যবান ও অপরূপ জিনিস কেনাবেচা করে ওর কোম্পানি । বিভিন্ন শহরে ও দেশে ওদের অফিস আছে ।

একটি রাশিয়ান ডলের অপূর্ব মডেল একবার অফিসে আসে । কর্মী হিসেবে নিলাম হবার আগেই সস্তায় কিনে নিয়ে আসে সুজাতা । ছেলেপুলেদের খুব পছন্দ হয় দ্রব্যটি । কিন্তু পড়শি মিসেস্ লিভিংস্টোন বলেন যে **এসব উট্‌কো জিনিস বাড়িতে না রাখাই ভালো । অনেক সময় দেখা গেছে এর থেকে অমঙ্গল হয় ।**

ডলটি এরজন্য দায়ী কিনা কেউ জানেনা তবে এরপরেই স্বামীর ব্যাভিচারের কথা জানতে পারে এবং বিয়ে ভেঙে যায় ।

বালাগুরুস্বামী ওকে অনেকবার বলেছে যে সবই মিথ্যা ।

যার কথা সুজাতা ভাবছে সে এক অসহায় নারী , বিদেশে এসে বিপদে পড়েছে বলেই বালা ওকে সঙ্গ দিয়েছে । **নাইদার হি স্লেপ্ট উইদ্ হার নর হি হ্যাজ এনি কাইন্ড অফ্ ইমোশান্স্ ফর হার । ইট্স্ জাস্ট আ প্রফেশনাল অ্যান্ড ফ্রেন্ডলি অ্যাসোসিয়েশান ।**

সুজাতা কিছুতেই মানেনি । কারণ কোনো বিপদে পড়া, অপরিচিত মহিলাকে সাহায্য করার অর্থ এই নয় যে তার ঘরে সারারাত কাটাতে হবে । ওর স্বামী , বালাগুরুস্বামী অবশ্যই সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে । বলেছে :: আমি কোনো শব্দের চক্রে ফাঁসতে চাইনা । শুধু তোমাকে জানাতে চাই যে অনেক কিছুই অনেক সময় করতে হয় যার কর্দয অর্থ বার করে কোনো লাভ হয়না । হিউম্যানিটি বলেও একটা শব্দ আছে জগতে । একজন অসহায়, সম্বলহীনা মানুষকে আমি এইভাবে রাস্তায় বার করে দিতে পারবো না ।

কাজেই সুজাতা দুই সন্তানকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে ।

সদ্য ডাইভোর্স হয়েছে ওদের ; বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সুজাতা আবার বিয়ে করেছে । ওদের অ্যান্টিক কোম্পানির এক অক্‌শন ম্যানেজারকে । বয়সে মোট ২৫ বছরের ছোট । কিছুদিন একই সাথে ছিলো ওরা ।

সুজাতার সব খবর রাখা এক্স স্বামী -- বালাগুরুস্বামী কিন্তু এখনও বিয়ে করেনি । আর কোনোদিন করবে বলেও মনে হয়না বন্ধুদের । বলে :: আমার তো বিয়ে হয়ে গেছে ।

কেউ হয়ত বললো : আবার করো । লোকে তো করে ।

বালা :: আমার তো বড় বড় ছেলেমেয়ে আছে । বাচ্চারা বড় হয়ে গেলে রোমান্স করার সময় কোথায় ? আর দু-তিনবার বিয়ে এইদেশের লোকেরা করে । আমি তো ভারতীয় !

কৃষ্ণচূড়া

অবিবাহিতা মেয়ে বীথি মল্লিকের এখন মধ্যবয়স । কিন্তু কৈশোর থেকেই সে মাথায় সিঁদুর লাগায় । হঠাৎ সেই লাল সিঁথিতে, রং চটেছে ।

বীথির লাল সিঁথি বহু মানুষের কৌতুহল জাগায় ।

বিশেষ করে আধাশহর মানিকগঞ্জে এটা নিয়ে লোকচর্চা হয় খুব । সবাই নিজ নিজ মতদান করে । কেউ কুৎসা রটায় কেউবা মায়াবী , দরদী গলায় ওকে সাপোর্ট করে । হয়ত এই হয়েছে , হয়ত সেই হয়েছে , হয়ত ওর কোনো উপায় নেই ইত্যাদি ।

সম্প্রতি মারা গেছে এলাকার ব্যায়ামবীর মিহির নন্দ ।

নন্দকিশোর ছিলো যখন তখন থেকেই গায়ে অসম্ভব জোর। বীথির ভাই বিভূতির সঙ্গে কুস্তি লড়তো । দুজনের খুব ভাব ছিলো ।স্কুলের মেয়ে বীথিকে একদিন খেলার ছলে পরিয়ে দিয়েছিলো নকল সিঁদুর ।

শাল পিয়ালের বনে গিয়ে ওরা সবাই খেলছিলো ।

সেইসময় রাজটিকা পরানোর মতন করে বলবান মিহির, বীথিকে

সিঁদুর পরিয়ে দেয় । তারপর খেলনা রথে করে ওকে নিয়ে পালায় । মিহির ভীষ্ম হয়ে ; ওকে অম্বা ফম্বা বানিয়ে খেলছিলো । রথটি আসলে প্রতিবার রথযাত্রার পরে, পথের একপাশে পড়ে পড়ে নষ্ট হত । পরের বছর নতুন রথ তৈরি করা হত । রথের মেলায় বীথিকে কাঁচের চুড়ি কিনে দিতো মিহির । পেস্তা , বেগুনি আর গাঢ় লাল এই কটা রং ওর প্রিয় ছিলো ।

মজা করে আঙুল কেটে, রক্তকণিকা নিয়ে বীথিকে নকল সিঁদুর পরিয়ে দেবার পর থেকে ও নিয়মিত সেই সিঁদুর লাগাতো ।

আগে বাড়ির লোকে ভাবতো খেলাঘরের খেলনা সিঁদুর ।

বাস্তবে হয়ত তাই ছিলো কিন্তু অন্তরে রং লেগেছিলো মেয়েটির । তাই মিহির বিয়ে করলেও বীথি আর বিয়ে করেনি । প্রথমদিকে চাপ দিলেও পরে বাবা-মাও কিছু বলেনি ।

বিউটিশিয়ান কোর্স করে নিজের দোকান চালায় । সারাটা দিন সেখানে হিন্দী সিনেমার গান চলে ।

সোনাক্ষী সিন্‌হাকে দেখতে রীনা রায়ের মতন , ও এক্সট্রা লার্জ সাইজ, ওর কপালে শত্রুঘ্ন সিন্‌হার মোটরগাড়ির সারি দাঁড়িয়ে থাকে , অনুষ্কা শর্মার হাঁ মুখটা বড় , ঐশ্বর্য রাইয়ের নাকটা বোঁচা আর ওপরের ঠোঁট আর নাকের মাঝে কম জায়গা ,

প্রিয়ংকাকে দেখতে একদম ডোনাল্ড ডাকের মতন মানে ওর ঠোঁটটা , সানি লিওনি আর রীনা রায়কে নাকি অনেকটা একরকম দেখতে , শিল্পার ফিগার লা জবাব আর ও যেই রেসিপি দেয় সেগুলিও স্বাস্থ্যকর , শাহিদ্ কাপুড়ের মধ্যে হিরো মেটেরিয়াল নেই , সঞ্জয় দতের বৌ মান্যতা রূপবতী তবে ওদের মেয়েটাকে দেখলে ঝোড়ো কাক মনে হয় , ক্যাট্রিনার চিক্‌নি চামেলি নাচের জবাব নেই , এরকম নাচ নাকি আগে দেখেনি ওরা , সল্লুভাই বিয়ে করবো বলে তারপর ভেঙে দেয় , রণভীর সিং খুব পেশিবহুল তবে মাথাটা ঝাঁকিয়ে খুস্‌কি ফেলে তাতড় তাতড় করে , এয়সে এয়সে এই এয়সে এয়সে করে নেচে দেখায় ওরা । ওর নাকি বীথির কাছে আসা উচিৎ খুস্‌কির জন্য --- অর্থাৎ বিনোদন জগতের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা আর মজা লোটা ।

কখনো পথভুলে আসে মিহির স্বয়ং । মেয়ের চুলে ছাঁট দিতে ।

মিহিরের বাড়ির লোক, ওকে বাইরে যেতে দেবেনা বলে ও এই আধাশহরে আছে । এখানে ব্যায়ামের ক্লাব চালায় ।

বৌ অনিমা, সেখানে ক্যাশ সামলায় । বীথির সাথে বন্ধুত্ব আছে ওদের ।

মিহির একবার ওকে বলেছে : তুই বিয়ে করিস্ নি কেন ? বিয়ে করে ফ্যাল্ । একা একা জীবন কাটাচ্ছিস্ কেন ?

বীথি দূর-দিগন্তে দৃষ্টি হেনে বলেছে :: কারণ অন্য কেউ আমার আগে বিয়ে করে ফেলেছে বলে !

মিহিরের চোখ চলে গেছে সবুজ সবুজ শালবন থেকে গাঢ় লাল কৃষ্ণচূড়া পথে ।

মিছিমিছি সিঁদুর পরানো যে কারো জীবন বদলে দিতে পারে এগুলি নাটকে , যাত্রায় দেখেছে । বাস্তব জীবনেও এসব সম্ভব আর তারই সঙ্গে এরকম ঘটেছে দেখে মিহিরের বুকে রোমাঞ্চ হলেও একটা গভীর দু:খের ঢেউ বয়ে যায় হৃদয় কুঠুরিতে ।

ও কি বীথিকে ঠকিয়েছে ? কিন্তু ছোটবেলায় কোথায় কী হয়েছে তার জন্য কেউ নিজের স্বাদ আহ্লাদ্ বিসর্জন দেয় ?

অনেক প্রশ্ন ভেসে উঠেছে মন ক্যানভাসে ।

মুখে শুধু বলেছে :: **পরের জন্মে কেউ হয়ত তোর সঙ্গে একই দিনে মালাবদল করবে । কী বলিস্ ?**

বীথি শুধু হেসেছে । তাতে অবিশ্বাস ছিলো না । ছিলো অদেখা প্রশান্তি । **যেমন শান্তি একমাত্র মনোবাসনা পূর্ণ হলেই মেলে ।**

ফাটল

মেয়েকে একা বিদেশে যেতে দেবেনা উল্কার পরিবার ।

উল্কা নায়েক --একজন সফল উকিল । বিদেশে গিয়ে **ল** নিয়ে আরো পড়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে । কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারে ওর বাবা ও মা চেয়েছিলো যে বড়মেয়ে উল্কা ওকালতি করে সংসারের হাল ধরুক । সাত ভাইবোনের মধ্যে উল্কা সবার বড় । ওর পরের ভাই ওর চেয়ে মাত্র একবছরের ছোট । নাম গৌর ।

গৌরও মেধাবী । ও অংকে পারদর্শী । বিদেশে অর্থনীতি নিয়ে পড়তে যাবার জন্যে স্কলারশিপ্ পায় । কিন্তু সংসারের হাল ধরে । উল্কারও একই হাল হয়েছিলো কিন্তু সে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় ।

দিল্লী গিয়ে, এক ধনীর অপোগন্ড পুত্রকে বিয়ে করে । লোকটি কর্পোরেট কর্মী হলেও খুবই অহঙ্কারি ও মেজাজি । ফলে প্রায়ই চাকরি চলে যেতো । ওর বাবা এক আমলা হওয়ায় বারবার চাকরি পেয়েও যেতো । আসলে ওর গার্লফ্রেন্ড মারা যায় দুদিনের রহস্যময় জ্বরে । সে ছিলো উল্কার ক্লাসমেট । মারা যাবার সময় উল্কার হাত ধরে বলে যায় যে এই লোকটিকে যেন সে দেখে । লোকটি একটু ক্ষ্যাপাটে কিন্তু মানুষ ভালো ।

উল্কার মনে রং লাগার চেয়েও বেশি প্রয়োজন ছিলো আশ্রয়ের ।

গ্রামীণ জীবন আর সংসারের হাল ধরে নিজের প্রফেশনাল জীবনে

সর্বনাশ ডেকে আনা কোনটাই ওর মনের মতন ছিলো না ।

কাজেই বিয়ে করে ফেলে পরিবারকে না জানিয়ে ।

যথাসময় বিদেশে চলে যায় ।

পরে ওর তিনটে মেয়ে জন্মায় । কিন্তু কেউই বিবাহিত জীবনে সুখী নয় । স্বামীর চোখ নষ্ট হয়ে গেছে ব্লাড সুগারে ।

তাকে দেখার জন্য লোক লাগে । একটা হোমে দিয়ে আসে ।

সারাদিন থাকে । বিকেলে বাড়ি ফেরে ।

মেয়েরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে এইটুকুই রক্ষা।

উকিল, সাইকোলজিস্ট আর গ্রাফিক ডিজাইনার ।

বড়জনের স্বামী বিয়ের প্রথম রাতে তাকে ছেড়ে চলে গেছে কারণ তার নাকি স্তন খুব ছোট । আগে বোঝেনি কিন্তু এই মেয়েকে নিয়ে সে থাকবে না ।

দ্বিতীয়জনকে দৈহিক অত্যাচার করতো তার লম্পট স্বামী ।

বিচ্ছেদ হবেই । আর ছোটজনের স্বামী পাড় মাতাল ।

মাসের মধ্যে কুড়ি দিন হাসপাতালে কাটায় । লিভারে পচন ধরেছে । আরো নানান ব্যাধি তাই মুখ দিয়ে বিষ্ঠা উঠে আসে মাঝেমাঝে । সেও খরচের খাতায় ।

নিজের স্বার্থপরতাকে দায়ী করে উল্কা এখন ।

বাড়ি ছেড়ে চলে আসার পরে ওর মা নাকি সাতদিন খাট থেকে ওঠেনি । এতবড় ধোকা হয়ত ভদ্রমহিলা মেনে নিতে পারেন নি । ছোট ছোট ভাইবোনগুলোকে আঁধারে ঠেলে দিয়ে ; মধ্যবিত্ত মেয়ের বিশ্বজয় -মায়ের আঁচলে আঁচড় কাটে ।

কথায় বলে, মায়ের অশ্রু, ঝরানো ভালো নয় ।

সাতদিন পরে ঘর থেকে বেরিয়ে মা শুধু বলেছিলো ::

ও মানুষ নাকি পাষাণ ?

এগুলো সবই উল্কা পরে শুনেছিলো । ভাইবোনেদের কাছে ।

ওদের পরিবারে এখনও নিয়ম করে অশ্রু ঝরে ; শুধু সেটা এখন উল্কার চোখের জল ।

আর অগ্নিকুন্ড থেকে অবিরাম জলরেখার সৃষ্টি হলে তা তো পূর্ণতা পাবার আগেই নিভে যায় কাজেই জলতরঙ্গ বাজতেই থাকে । থেকে থেকে , প্রচন্ড বেসুরে ।

ওর মা যেন ওকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে- এতবছর পরে ।

ডাকাত

ট্রাক ব্যবসায়ী ; মল্লার কুন্ডুর সুবিশাল বাড়ি । ইন্টার স্টেট ট্রাক ও লরির ব্যবসায় ফুলে-ফেঁপে ওঠা মল্লারকে ওর মারোয়াড়ি ও গুজরাতি বন্ধুরা ডাকে মল্‌হার বলে ।

মল্লারের বাবার -বিশাল নাহলেও সম্পত্তি মন্দ ছিলো না । লোকটি কাঁসা পিতল নিয়ে কাজ করতো । কমবয়সে ওদের চার ভাই ও এক বোনকে রেখে মারা যায় ।

বড় দাদা কেদার , সরকারি চাকরিতে ঢুকে ওদের দাঁড় করায় ।

পরে মল্লার ও পরের ভাই মন্দারের, যুক্ত ট্রাকের ব্যবসায় ওরা রীতিমতন ধনী হয়ে ওঠে ।

মন্দার এখন আলাদা হয়ে গেছে ।

একমাত্র বোন মালতীর বিয়ে হয়েছে এমন এক পাত্রের সাথে যে ঘরজামাই থাকে মল্লারের বাড়িতে । বৃদ্ধা মাও এখানেই থাকে । থাকে ছোট ভাই ইন্দর । জামাই মহাশয়ের কোনো সন্তানও নেই । অসম্ভব পেটুক লোকটি । **ওদের বিশাল দোতলা রসুই ঘর ; বাড়ির অন্যদিকে ।** কিচেন একতলায়- সামনে বারান্দা । সেখানে ঢুকেই বড় খাবার জায়গা । এত বড়লোক হলেও ওরা মাটিতে বসে খায় । রসুইঘরের দোতলায় স্টোর রুম । সব নিয়ে আলাদা একটি ইউনিট আর কি !

সবার খাওয়া হয়ে গেলে ওখানে তালা মেরে দেওয়া হয় । জামাই বাবাজী ঘটেশ্বর ;যাকে সংক্ষেপে লোকে ঘটো বলে ডাকে সে একটি লম্বা বাঁশের সিঁড়ি নিয়ে -দোতলার স্টোরে হানা দেয় প্রায়ই । লুকিয়ে । অজস্র খাদ্যকণা সংগ্রহ করে, খেতে খেতে বাগানে ঘোরে । লোকটির সহজে পেট ভরে না । মল্লার ও ইন্দরের বিশেষ প্রিয়পাত্র বলে কেউ কিছু বলতেও পারেনা শুধু মাঝেমাঝে ওর স্ত্রী ওকে কটূ ভাষায় কটাক্ষ করে ।

মজা করে মল্লার ও ইন্দর ওকে ডাকাত বলে ডাকে ।

সবাই কেবল ভাবে- যখন বাড়ির লোকে ওর চুরির ব্যাপারটা জানেই আর কিছু বলেও না কেউ, তখন ও সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে খায় না কেন ?

ওদের বৃদ্ধা মা বলে :: মনে হয় অতিভোজন করছে তাই লজ্জা পায় সামনে দিয়ে যেতে । আমাদের খুকির এমন দূর্ভাগ্য যে এমন জামাই জুটেছে ।

আসলে খুকি অতিকায়া । হিন্দি সিনেমার টুনটুনের মতন দৈহিক গঠন কাজেই পাত্র জুটছিলো না ।

যে যাই বলুক না কেন আসল ঘটনা হল এই যে ঘটো , বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে উঠে- স্টোররুম থেকে চুরি করে খাবার নিয়ে- ওদের নদীর ধারে যায় । সেখানে একটা স্বপ্নে পাওয়া কালীমায়ের মন্দির আছে । সেই মন্দির চত্বের বহু ভিখারি থাকে । সন্ধ্যা গাঢ় হলে ঘটেশ্বর ; মন্দিরের ঘটে নাহলেও ওদের ভিক্ষার ঝুলিতে ভরে দেয় অফুরন্ত আনাজ ও সবজি । শুভলগ্নে মিষ্টিও । **হয়ত ঝানু ব্যবসাদার মল্‌হার ব্যাপারটা জানে, তাই জেনেশুনেও ডাকাতকে প্রশ্রয় দেয় ।**

সমাজ সংস্কারক

ভারতে ফিরেছে জন নাগ । উত্তরবঙ্গের এক শহরে বাড়ি কিনে আছে । প্রায় চল্লিশ বছর পরে ফিরেছে । আগে স্বপাক আহার করতো এখন এক দরিদ্র স্কুল মাস্টারের মেয়েকে বিয়ে করেছে ; সেই রাঁধে বাড়ে । তার নাম উত্তরা কর্মকার ।

উত্তরাকে অল্পস্বল্প ইংলিশ শেখাচ্ছে তার স্বামী ।

সাহেবি কায়দায় অভ্যস্থ , হাই হ্যাল্লো , নাইস অফ্ ইউ , ইট্স মাই প্লেসার ইত্যাদি বদলে ফেলতে হয়েছে । দামী গাড়ি অবশ্য চড়ে । নেপালে , ভূটানে যায় ।

গরীবের মেয়েকে, এমন এক মানুষ বিয়ে করেছে দেখে মেয়ের বাড়ির সবাই খুবই আনন্দিত ।

লোকটি মানে জামাতা জন নাগ বিদেশে কী করতো ওরা বোঝেনা তবে সহজ ভাষায় যা বলেছে তা হল ভিডিওর ব্যবসা । আদতে পর্ণো সিনেমার ব্যবসা করতো । অ্যাডাল্ট ব্যবসা ।

অ্যাডাল্ট শপ্ও চালাতো । এখন দরিদ্র এক ভারতীয় মেয়েকে বিয়ে করে সমাজ সংস্কারের দিকে ঝুঁকেছে ।

কিছুটা হয়ত আঁচ করেছে ওর বৌ উত্তরা । ওর দেওয়ালে একটি পরিচিত মুখ দেখে । সানি লিওনি ।

সমাজ সংস্কারকের অতীত নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনই মানে হয়না সেটাও বোঝে উত্তরা । কারণ আজ সে সুখী , সম্মান পেয়েছে একজন **এন আর আইয়ের ঘরণী** হিসেবে আর কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বার করার কোন ইচ্ছেই তার নেই কাজেই জন নাগের সাথেই আছে হরষে বিষাদে ।

হস্তা

আকাশে যার বাস সেই নক্ষত্রের নামে নামকরণ করলেও মানবী হস্তা একটু অন্যরকম মানুষ ।

বিভিন্নভাবে লোককে ঠকানো ওর নেশা । ভারত থেকে ভস্ম এনে মানুষের উপকার করে বলে বাজারে নাম আছে । ওয়েবসাইট খুলে দূরদূরান্ত থেকে ক্লায়েন্ট ধরে । সবাইকে ম্যাজিকাল ভারতের ভস্ম দিয়ে সুস্থ করে ।

ভারতের জাদুতে অনেকেই মুগ্ধ । জড়িবুটির দেশের অনেক কিছুই এখন বিদেশীরা জানে আন্তর্জাল আর স্বামী রামদেবের কল্যাণে । তবে বেশিরভাগ ভস্মের এত দাম যে সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে । সেই সুযোগটাই নেয় হস্তা গাঙ্গুলি । ব্রাহ্মণ সন্তান বলে গর্বিত । ব্রাহ্মণত্ব ওর অহংকার । বিয়ে করেছে এক কায়স্থর ছেলেকে । উঠতে বসতে তাকে কটাক্ষ করে, জাতপাত নিয়ে ।

লোকটি ভালোমানুষ ও শান্তিপ্রিয় । তাই এখনও মিনি উগ্রপন্থার দিকে পা দেয়নি। গৃহযুদ্ধে , শান্তি আনতে সবরকম কাজ করে । বৌকে খুশি করতে তার পা টিপেও দেয় ।

বৌ কেবল বিদেশীদের ভস্ম দেয় । তাবিজের ভেতরে থাকে এই ভস্ম । ওর দোকানে গেলে ফ্রিতে নিরামিষ সিঙাড়া আর চা মেলে । কোনো কোনো শুভলগ্নে নিরামিষ পিৎজা আর ফ্রেঞ্চ

ফ্রাইস্ । সবই ফ্রিতে । এটা ভারতীয় সংস্কৃতির নমুনা । অতিথি ভোজন , অতিথি নারায়ণ , বসুধৈব কুটুমবকম্ ।

বিদেশীরা হাঁ করে দেখে । আর ভস্ম তো আছেই !

ইন্ডিয়া থেকে আনায় তাই কস্ট একটু বেশি তবে বাজার চলতি বস্তুর থেকে অনেক অনেক কম । আসলে সে দেয় স্বর্ণ , হীরক, রূপা ভস্ম । এতে নাকি নানান দূরারোগ্য ব্যাধি সেরে যায় ।এই ভস্ম ব্যবহার করে অনেকের সারে, অনেকের সারেও না কারণ আসল ডাস্টের সেইরকম গুণ থাকলেও, হস্তা কোনো ভেষজ চিকিৎসক নয় ,সে এমনি এগুলি করে । হাতুড়ে ডাক্তারের মতন ।

লোকাল এক জহুরির কাছ থেকে সস্তায় কিনে, এইসব ডাস্ট দিয়ে তাবিজ বানিয়ে- বিদেশী ঠকানো হস্তার আবার নিজ গৃহপালিত পশু- **যার পোশাকি নাম স্বামী,** তার চাকরি ও পোস্ট নিয়ে অসম্ভব গর্ব ! স্বামীর কল্যাণেই বিদেশবাস সম্ভব হয়েছে । স্বামী তার দক্ষিণ হস্তও, মানে চাক্‌রা আর কি ! সে একটি সংস্থার ডেপুটি ডাইরেক্টর । নিন্দুকে বলে ::ডেপুটিতেই এত দাপট ? ডাইরেক্টর হলে না জানি কী হত !!

আগে ফার্স্ট ক্লাস দেশের সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন হবেনা বলে বিদেশে সেটেল হতে চায়নি আর এখন বিদেশের মধু টেস্ট করে মধুলোভী ভোমরা হয়ে উঠেছে । বড় মসৃণ জীবন পরবাসে !

বিদেশে এখনও মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করে । তাই আজও ক্লায়েন্ট আসে ওর অফিসে, দোকানে । মৃতসঞ্জিবনী সেই ভস্মের লোভে,প্রতিদিন ।

কিন্তু এটা বিদেশ । ফার্স্ট ক্লাস দেশ ! তাই বুঝি সত্যি সত্যি এই থার্ড ক্লাস সিটিজেনকে একদিন পুলিশে ধরে এবং পাক্কা ৫০ বছর পরে ওর সিটিজেনশিপ ক্যান্সেল করে দেয় । ওকে দেশে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হয় আইন অনুসারে ।

<u>গগনচারী, হস্তা নক্ষত্রের কোনো স্ফুলিঙ্গও আর বাঁচাতে পারেনা তাকে ।</u>

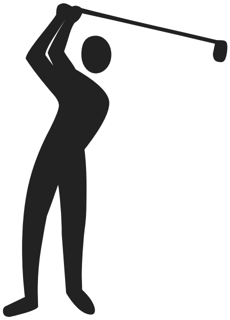

প্রযুক্তি

বিখ্যাত অভিনেতা বা **স্টার আদম সিং,** পা ছুঁয়ে প্রণাম করার সময় নাকি উঠ্তি নায়িকাদের পশ্চাৎদেশে হাত দিতে অভ্যস্থ । অনেক মেয়ে অভিযোগ করলেও, আজ পর্যন্ত কেউ ওকে হাতেনাতে ধরতে পারেনি ।

দু-একজন ওর বিরুদ্ধে কেসও করেছে কিন্তু কোর্টে কিছুই প্রমাণ করা যায়নি আর আইন তো প্রমাণ চায় ।

মনমরা হয়ে যায় মেয়েরা ! স্থির করে , ওকে আর প্রণাম নয় ।

তবুও অনেকেই নতুন উদ্যমে প্রণাম করতে উদ্যত হয় । **এত বড় ফিল্মি হিরো !**

বিদেশ থেকে এক যুবতী, যে মিস্ এশিয়া হয়েছিলো , সে একবার ভারতে যায় । এখন স্বামীর সাথে এশিয়ার অন্য উন্নত দেশে থাকে । সেখানে প্রযুক্তি খুব এগিয়ে । সবকিছু করার জন্যই মেশিন আছে । পিঠ চুলকাচ্ছে ? একটা ইলেকট্রনিক হাত

এসে সুন্দরভাবে পিঠ চুলকে দেবে । একটু জোরে আবার মিহি করে আবার বুলিয়ে মানে দারুণ ব্যাপার ।

এই প্রাক্তন মিস্ এশিয়া , ঐশী দত্ত- ভারতে যাবার আগে স্বামীকে জানায় এই স্টারের ব্যবহার ও ব্যাভিচারের কথা ।

ওর স্বামীর বক্তব্য হল :: **ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ল্ডের লোকগুলি বেজায় খারাপ। ওদের না কোনো মরাল আছে না এথিকস্ !**

নোংরামোতে নোবেল প্রাইজ থাকলে সবকটা পেতো।

ঐশী তর্ক করেনা। লজিক বনাম ক্রিয়েটিভিটির লড়াই বহুল প্রচলিত।

সময়মতন মুম্বাই পৌঁছায়। প্রাক্তন মিস্ এশিয়াকে আদতে এক পুরস্কারে ভূষিত করতে চলেছে এক ফিল্মি সংস্থা।

মায়ানগরের মায়া নয় **আসল মূর্তি** হাতে নিতে যথাসময়ে হাজির হয় স্টেজে , ঐশী দত্ত। সেই প্রখ্যাত, লাইম-লাইট অবসেসড্ স্টার যিনি ক্যামেরা ছাড়বেন না বলে এখন মৃত সৈনিকের রোল করেন , তিনিও হাজির স্টেজে। নানান বক্তৃতার পরে উনি পুরস্কার তুলে দেন ঐশীর হাতে।

হঠাৎই প্রচন্ড জোরে ও তীক্ষ্ণ শব্দে বেজে ওঠে এক আজব বাঁশি। পিন ড্রপ সায়লেন্স তখন , হাততালি শুরু হয়নি কারণ ঐশী সেই স্টারের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেছে। লোকে অবাক হয়ে চোখ চাওয়াচাওয়ি করছে। হল কী ? টেররিস্ট অ্যাটাক্?

আসলে ঐশীর ইঞ্জিনীয়ার স্বামী ওর হিপে, স্বরচিত- একটি সেন্সার লাগানো বিশেষ কোমড় বন্ধনী পরিয়ে দিয়েছিলো। কেউ হিপে টিপ্ দিলেই যা নিজে থেকে বেজে ওঠে।

<u>অপার্থিব</u>

হিমালয়ের এক বরফরাজ্যে ; **<u>স্কি</u>** করতে গিয়ে আলাপ হয়েছিলো এক ভারতীয় মেয়ের সাথে, জেসন রিভের ।

সদ্য বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়া রিভের সময় খুব খারাপ যাচ্ছিলো ।

মা মারা গেছে । বাবাকে অসুখে ধরেছে । বৌ-ও পলাতকা ।

কাজেই মনমরা জেসন, পাহাড়ে- প্রিয় স্কি করতে যায় একটি বন্ধু গ্রুপের সাথে । এদের সাথে আলাপটিও বড় আজবভাবে হয়েছে । একদিন জেসন ট্রেনে করে, দুপুরে বাড়ি ফিরছিলো । তখন এদের এক সদস্যও ট্রেনে করে যাচ্ছিলো । দুপুরের ফাঁকা ট্রেনে মুখ গোমড়া জেসনকে দেখে প্রশ্ন করে, সহযাত্রী মিস্টার আহুজা, কেন সে এত মনমরা । সঙ্গী পাবে মনে করে একা থাকা জেসন, ওকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায় গল্পের অজুহাতে । সেখান থেকেই এই দলের সাথে বন্ধুত্ব । নিয়মিত ওরা একসাথে খেতেও যেতো ।

জেসনের হিমালয় সফরে , খুঁজে পেলো বিধবা নীলম্‌কে ।

স্কি করতে গিয়ে কাঁধে চোট লাগা সত্ত্বেও ও রাতের বেলায় পাবে নাচতো । লোকাল পাব । সেখানে নীলম্‌কে পায় । পরবাসে, নীলম্ ওকে সাহস যোগায় আর মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে দেয় ওর একাকীত্ব ও বিদেশ বাসের অস্বস্তি ।

পাহাড়ে অভিযানের পরে যেটুকু সময় থাকতো , ওরা একসাথে গরমাগরম চা পান করতো । দূরে বরফের পাহাড় । কিছুটা কোল্ড ডেসার্টের হাতছানি আর ওদের বড় বড় তাঁবু ।

ভেসে আসে বৌদ্ধ গীত । টুং টাং আওয়াজ আর সিডিতে Ani Choying Drolma এর - Great Compassion Mantra শুনতো । এই গান আগেও ইউ-টিউবেও শুনেছে । কিন্তু নীলম্ এর গলায় শুনে খুব ভালোলাগতো ।

এরকম চারুশীলা নীলম্-ই ওকে ছেড়ে দিলো শেষে ।

ও নাকি নান্ হবে । হিমালয়ের নানান মনাস্ট্রিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই কারণে । ওর বাবা মায়ের আপত্তি আছে কারণ নান্ হওয়া সহজ নয় , নানের জীবন খুব কঠিন । অনেক কষ্টসাধ্য সাধনার আওতায় আসতে হয় , অবসেসিভ্ থটস্‌গুলিকে কন্ট্রোল করার জন্য । **কোয়াইট মাইন্ড কিংবা নো মাইন্ড স্টেটে যাওয়া সোজা কথা নয় ।** অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয় । মেয়ে কি পারবে এইসব? এত কমবয়সে ? তাই ওর বাবা মা খুবই চিন্তিত ওকে নিয়ে । নীলম্ কেবল হিমালয়ে ঘুরে বেড়ায় । শান্তির আশায় । বিভিন্ন গুম্ফায় লামাসঙ্গ করে । মাথা ন্যাড়া করে ফেলেছে । পরণে মেরুন লুঙ্গির মতন পোশাক যা কিনা দেহের উপরিভাগেও জড়ানো । কানে তামার রিং । এই ভারতীয় মেয়ের প্রেমে পড়লেও, সে তাকে ছেড়ে দেয় ; ওর নিজের লজিক আছে এই বিচ্ছেদের । কথায় বলে, **নীলা নাকি সবার সয়না ।** হয়ত জেসন সেরকম কেউ ।

ওকে বলেছিলো যে বাসায় বসেও সন্ন্যাস নেওয়া যায় । অনেক সাধু-সাধ্বী তো বিয়ে শাদিও করেছেন !

কিন্তু নীলম্ এসব শোনার বান্দা নয় । তার মতে কেউ কেউ বিয়ে করলেও, ও সাধু মানে অবিবাহিত মানুষই ভাবে ও পছন্দ করে তাই বৌদ্ধ্য হতে চাওয়া । আর বিয়ে তো ও করেছিলো !

খুব ভেঙে পড়ে জেসন । যদিও বা হিমালয়ে এলো মন ভালো করতে, প্রিয় স্কিয়িং করে-- কিন্তু দেখা গেলো মনটা আবার ভেঙেই গেলো । চুরমার হয়ে গেলো বলাই ভালো ।

ফেরার দিন ঘনিয়ে আসছে । নীলম্ তবুও তাঁবুতে আসে ।

গরম চা খেতে আর Ani Choying Drolma এর গ্রেট কম্প্যাশান মন্ত্র শুনতে । তখন ওকে স্যান্ডউইচ্ খেতে দেয় জেসন । নিরামিষ খায় সে । তাই ভেজ স্যান্ডউইচ্ । একস্ট্রা চিজ নেয় সবসময় । জেসন রসিকতা করেই বলে :: চিজ খাওয়া আর পাবে যাওয়াটা কমাতে হবে নান্ হতে গেলে !! **(ডার্ক হিউমার)**

ফেরার সময় পোর্টারের সাথে নীলম্ও অনেক দূর এলো ।

বিমানবন্দর থেকে প্লেন ধরে দিল্লী আসার কথা ।

মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে ওর । ভীষণ তচনচ করে দিয়েছে হিমালয় । মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক । তবুও বারেবারে অজানার দিকে ছুটে চলি আমরা । মনে- চন্দনের স্নিগ্ধ প্রলেপ দিতে এসে কী বিড়ম্বনা ! মন আয়না ভেঙেচুরে একাকার ।

দিল্লী অবধি পৌঁছে একটু খেয়ে নিলো এয়ারপোর্টের দোকানে। কিছু গিফট্‌ কিনলো। তারপর লাউঞ্জে বিশ্রাম নিতে গেলো।

গভীর রাতে দেশের বিমানে চড়বে। প্লেন গিয়ে থামবে দোহাতে। সেখান থেকে অন্য প্লেনে সোজা দেশে !

দিল্লী থেকে দোহা অবধি ঘুমিয়েই কেটে গেলো।

দোহা থেকে প্লেন বদলে অন্য প্লেনে। ওদের দেশের প্লেন কোম্পানি এটা।

যখন সীটে গিয়ে বসলো তখন পুরো **ও-হেনরির গল্প।**

ওর পাশের সহযাত্রীকে দেখে ভূত দেখার মতন চমকে উঠলো।

ওর বিচ্ছেদ হওয়া স্ত্রী মারিয়াম। মারিয়াম এখানে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল দেখতে এসেছিলো। পেশায় সাংবাদিক ওর স্ত্রী বর্তমানে একটি গসিপ্‌ ম্যাগাজিন চালায়। বলে :: এগুলোরও দরকার আছে। পরের ওপরে স্পাইয়িং করে করে মজা নেওয়া আর কি। জেসন বুঝতে পারেনা যে একজন সিরিয়াস সাংবাদিকের গসিপ পত্রিকা খোলার কী দরকার থাকতে পারে অথবা পরের জীবনে পোদ্দারি করা কবে থেকে ওর কাজের মধ্যে চলে এলো।

কিন্তু অবাকের সাথে সাথে খুশিও হয়েছে। ওকে ; জেসন খুব ভালোবাসে। নীলমের থেকে অনেক বেশি। নীলম্‌ কথাও বললো ওকে। ওর চোখের কোণায় ঈষৎ হাসি।

ওকে সময় দিতে পারতো না মারিয়াম, কাজের কমিট্‌মেন্টের জন্য । এখন গসিপ্‌ পত্রিকা চালায় বলে অনেকটা সময়ই বাড়ি থেকে কাজ করে । কাজেই সময়ের আর তত অভাব নেই ।

শেষদিকে-- আগের মতন ওর কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলো মারিয়াম । চৌকো মুখ, সোনালি চুল আর সেক্সি ঠোঁটের মেয়ে ।

ওর বিভাজিকা দেখা যাচ্ছে , সবুজ পোশাকের মধ্য দিয়ে ।

ক্রমশ জেসন লোভী পুরুষ হয়ে উঠছে ।

নামার সময় নিজের কার্ড দিলো মারিয়াম ; একদিন বাড়িতে ডিনার করতে ডাকলো । এমন একদিন যেদিন শুধু ওরা দুজন থাকবে আর কেউ না ।

জীবনের প্রতি বাঁকেই ও হেনরি । তাই তো উনি জেসনের প্রিয় লেখক !

রাজনন্দিনী

রাজনন্দিনী মন্দিরার জন্য ক্ষেপে উঠেছিলো সেনা অফিসার কমল কুমার । সেনাবাহিনীতে কাজ করা এই বিবাহিত যুবকের রূপ ও বীরত্ব ; লোকচর্চার বিষয় রীতিমতন । মন্দিরাকে খুবই সুন্দর দেখতে । সোনালি বেন্দ্রের মতন অনেকটা । অনেকটা মৌসুমির মতন । মৌসুমি চ্যাটার্জ্জী ।

অভিজাত, রুচিপূর্ণা এই রাজনন্দিনী, বহু পুরাতন এক রাজ পরিবারের বংশধর । ঠাঁটবাট আগের মতনই আছে । এখন ব্যবসায় ঝুঁকেছে সবাই ।

বিবাহিত সেনা-অফিসার নি:সন্তান । স্ত্রী একা পিত্রালয়ে থাকতো । ওখানে একটি স্কুলে পড়াতো সে । নাম রত্নাবলী ।

রত্না একদিন জানতে পারলো, তার স্বামীর এই অভিশপ্ত ভালোবাসার কথা । ডুবে গেলো মদে । ওর বাবাও আর্মিতে ছিলেন তাই বাড়িতে মদের প্রচলন ছিলো । ছিলো ছোট্ট একটি বার । মদ্যপান করে করে কয়েক বছরের মধ্যে লিভারের অসুখে মারা গেলো যুবতী রত্নাবলী । স্কুল থেকে যাকে বিতাড়িত করে ওদের প্রিন্সিপ্যাল ।

স্ত্রীর মৃত্যুর পরেই যেন চেতনা ফেরে কমলের । কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গেছে ততদিনে ।

রাজকুমারী মন্দিরা, ওর সাথে সম্পর্ক পাতালেও বিয়ে করলো এক মুসলিম যুবককে যার রক্তে নবাবের কণিকা ছিলো ।

দুই রাজবংশ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলো ।

আজ ২৫ বছর পরে, ছেলেপুলে নিয়ে ঘোর সংসারি রাজনন্দিনী মন্দিরা বেগম । সুখে আছে, ভালো আছে ।

সব হারানো সেনাবাহিনীর প্রাক্তন অফিসার কমল কুমার এখন থাকে এক বস্তিতে । এক কামরার এক বাসায় । সামনে বস্তির চারকোণা চৌবাচ্চা । আকারে বেশ বড় । সবাই জল তোলে । কেউ কেউ নেমে স্নান করে । আর অজস্র হাঁস ওখানে ভেসে বেড়ায় ।

মেয়েদের কাঁচের চুড়ির দোকান চালায় কমল কুমার । অবসর নিয়ে বাকি জমানো টাকায় এই দোকান খুলেছে ।

শেষদিকে কোনো কাজ করতো না । এখনও একবেলা খায় । কারণ খদ্দের সেরকম হয়না ।

রাজনন্দিনীকে আসলে এক বোম ব্লাস্টের হাত থেকে বাঁচায় এই অফিসার । সেই থেকেই প্রেম কিন্তু পরিণয় হয়নি ।

ওর স্ত্রী রত্নাবলী ওকে ডাইভোর্স দিতে চায়নি ।

দিলেই কি বিয়ে হত ? মনে হয়না । কারণ মন্দিরা এমন কাউকে বিয়ে করবে ভেবেছিলো কৈশোর থেকে ; যার রক্ত নীল ।

কারণ প্রেম ফ্রেম অনেকের সাথেই করা চলে ,   কিন্তু বিয়ে অনেক পবিত্র ও সিরিয়াস জিনিস ।

বিয়ে করতে হয় সমান সমান ঘরে, নাহলে ডাইভোর্স হবেই ।

ষাড়

মুম্বাইয়ের উল্লাসনগরে থাকে বিজন মল্লিক । বহুদিন বিদেশে ছিলো । যৌবনেই চলে আসে দেশে ; **এক মেম-বৌ সঙ্গে নিয়ে ।** বৌয়ের নামকরণ করে সিগ্ধা । ওর আসল নাম ছিলো পলি তাই শর্টে সবাই পলি বলেই ডাকতো । পলি ভারতে গিয়ে পুরো ভারতীয় হয়ে ওঠে । সন্ধ্যায় ঘরে ধূপধুনো দেওয়া থেকে শুরু করে মাছের ঝোল আর ঝিঙে পোস্ত রান্না করা- সবই শিখে নিয়েছিলো ।

বিজন, কোর্টে কোর্টে গিয়ে মোটা টাকার বিনিময়ে মিথ্যা সাক্ষী দিতো । ওর নিপুন কাজের জন্য বেশ নামডাক হয় । সবাই ওকেই সাক্ষী হিসেবে ডাকে । জাজও জানতেন যে বিজন যখন কাঠগড়ায় তখন কারো না কারো বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে এসেছে জেনেশুনে ; অর্থের বিনিময়ে ।

বাইরে, জাজের সাথেও কথাবার্তা হত । রীতিমতন মিনি সেলিব্রিটি , সাহেবি ইংলিশ বলা , চুরুট মুখে দেওয়া বিজন ।

ওর স্ত্রী, গৃহকর্মে নিপুনা হলেও চাকরি করতো এক শপিং মলের সেলস্‌ওম্যান হিসেবে । এই মলে সস্তায় সব জিনিসপত্র পাওয়া যায় , বাল্কে । কফি--একইসাথে ৬টা, আচার দশ বোতল এইরকম আর কি । সেখানে কাজ করে মন্দ আয় করতো না এই মেমসাহেব । হাতে কাঁচের চুড়ি আর কপালে বিন্দি !

দুই সন্তানকে ভালোভাবে মানুষ করার চেষ্টা করছে । ইংলিশ স্কুলে দিয়েছে । তারা, ক্লাসে প্রথম পাঁচজনের মধ্যেই থাকে ।

একদিন এক উকিল, ওদের বাড়িতে খেতে আসে । এসে কৌতুহলবশতঃ ওর স্ত্রী পলিকে, জিজ্ঞেস করে বসে যে সে জেনে শুনে কেন তার স্বামীকে এই মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ার কাজ করতে দিচ্ছে !

উত্তরে স্নিগ্ধা বলে ওঠে :: বিদেশে ও কী করতো জানো ? বুল ফাইটিং ! নিজেকে পুরুষালি করে , নিজের বীরত্ব ও বল দেখানোর জন্য পাগলা ষাড়ের সাথে লড়তো ।

অসম্ভব হিংস্র , পাগলা ষাড় ধেয়ে আসতো ওর দিকে ।

মাঠে পরীক্ষা করা হত কোন ষাড়ের সবচেয়ে বেশি হিংস্রতা । তারপর তাকে খেলায় নামানো হত । আমি ভয়ে কাঁপতাম । ওকে বললে ও গ্রাহ্য করতো না মোটেই । ও বলে , ছেলেদের ম্যানলি হওয়াই কাম্য । যেই পুরুষ কোমড় ব্যাথায় ভোগে আর ভয়ে কাঁপে তাকে গুলি করে মেরে ফেলা উচিৎ ! মেল ইগোর আরেকভাবে প্রকাশ হল তার দৈহিক বল । সেটা তার আরেকধরণের ইজ্জৎ এর ব্যাপার । যেমন মেয়ে বলতে সাধারণতঃ লোকে কোমল এক চেতনার কথা ভাবে , কুস্তিগীরের স্বপ্ন দেখেনা যে আঙুল মট্মট্ করে ভাঙবে , আঙুলগুলি পদ্মকলির মতন নরম হবে সেরকমই পুরুষ মানেই বলবান কেউ । নারকেল গাছের মতন কথায় কথায় নুইয়ে পড়বে না , এ হে হে ! হে হে এরকম করে ।

। কাজেই এখন ও হয়ত মিথ্যে সাক্ষী দেয় কিন্তু ষাড়ের সাথে লড়াই করেনা বলে প্রাণভয় থাকেনা । এতে হয়ত মান যেতে পারে ; হয়ত জরিমানাও হতে পারে কিন্তু জীবন জুয়ায় নামতে হয়না বলেই রক্ষে !

জংলী

ঘন বনের ধারে ; একটি চিতাবাঘের বাচ্চা পড়েছিলো অনেক অনেক দিন । শেষদিকে না খেয়ে খেয়ে ওর হাড়গুলি বেরিয়ে পড়ে ।

বনপথে- পথিকেরা ও মোটরগাড়ির যাত্রীরা, দিনের পর দিন ওকে দেখে দেখে অবশেষে বনবিভাগে খবর দেয় । বনবিভাগ ওকে তুলে নিয়ে যাবার আগেই এক ধনী ব্যবসাদার ওকে নিজের পোষ্য করে নিয়ে যায় ।

আসলে-**বনবিভাগই, চিড়িয়াখানা থেকে ওকে বনে ছেড়ে দিয়েছিলো** । মুক্ত আকাশের নিচে বেড়ে উঠুক জংলী পশু ! কিন্তু দূর্ভাগ্য চিতা শাবকের- কারণ বংশ পরম্পরায় , খাঁচায়

থাকা এই জন্তুটি ভুলে গিয়েছে শিকারের নিয়ম কানুন । ক্ষিপ্রতা ও হিংস্রতায় অনেক পেছনে সে এখন । তাই রিফ্লেক্স কমে যাওয়া এই শিশুটি অনাহারের কবলে পড়ে ।

এক সভ্য পশু, যার পোশাকি নাম মানুষ--এসে এই অসভ্য, জংলী জানোয়ারকে খাবার যোগায় ।

এই পন্থার নাম সংবেদনশীলতা । এরই স্পর্শে বুঝি ধীরে ধীরে বন্য চিতা , জংলী থেকে ধীরস্থির ও অভিজাত হয়ে যায় ।

লাল গোলাপ

ঝিলমঝিরি ন্যাশেনাল পার্কের কাছেই মেটে পাহাড়ের সারি । সেই পাহাড় ভেদ করে গেলে এক গোলাপ বাগিচা- যেখানে সুগন্ধী ফুলের বাহার ও একটি লোকাল কাফে ।

কাফের মালিক এক ভূটিয়া কাপেল । এইদেশে উদ্বাস্তু হয়ে কাজের আশা নিয়ে এসেছিলো, এখন কাফে চালায় । আগে হিমালয়ের রিফিউজি ক্যাম্পে ওদের বাবা, মা, ঠাকুমা ইত্যাদি কুড়ি বছর কাটায় । পরে ওকে ঘাড়ে নিয়ে হেঁটে, লম্বা সফর করে তারপর জিপ ও তারও পরে মিলিটারি ট্রাকে করে বিমান বন্দরে গিয়ে স্পেশাল বিমানে করে বিদেশে আসে ।

ওরা খুবই ছোট্ট একটি কমিউনিটি বলে ওদের তাড়িয়ে দেয় ওদের দেশ থেকে, অন্য কোনো কমিউনিটি । কিরাৎ নামক এই লোকটি বিদেশে এসে প্রচুর সংগ্রাম করে । ভাষা ছিলো সবচেয়ে বড় সমস্যা । সাইন ল্যাংগুয়েজে কথা হত । আরো বড় সমস্যা হল ওরা দেশে থাকতে ফার্মের কাজ করতো । ভুট্টা , ধান ইত্যাদি ফসল ফলাতো বলে এখানেও ওদের সেই কাজই দেওয়া হয় কিন্তু উন্নত প্রযুক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হওয়ায় ওদের ভারি অসুবিধে হত ।

কাজেই ধীরে ধীরে ওরা ফুল চাষের দিকে চলে আসে । সঙ্গে কাফে । বাবা ও মা এখন অবসর জীবন কাটায় । ঠাকুমা স্বর্গে গেছেন ।

এই কাফের নাম ::হেমলাল জিন্‌পা ।

এখানে ভ্যাড়া, গরু, শূকর, ইয়াক মান চমরি গাই ও মূর্গি সহ পাঁঠা ও হরিণের মাংসও পাওয়া যায় । রেড রাইসের পোলাউ ও স্যালাড, ভূট্টার বড়া আরো অনেক কিছু মেলে ।

পাশেই ওদের গোলাপ বাগান । সুন্দর গন্ধে মো মো করে রেস্তোরাঁ ।

এখানেই নিয়মিত খেতে আসে সোহিনী দেববর্মা ।

মাত্র আঠারোতে সে চাকরি জগতে ঢোকে । বারো ক্লাস পাশ করেই কম্পিউটার শিখে নিয়ে সে একটি ট্র্যাভেল এজেন্সিতে ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের কাজ নেয় । ১৯৯০ সালে সে তিন হাজার টাকা মাইনেতে কাজ করতো । মন্দ নয় ।

পরে ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে বি-এ পাশ করে । একটা গ্র্যাজুয়েশান না করলেই নয় তাই । পদোন্নতির জন্যেও লাগে তো তাই । আসলে সে কৈশোর থেকেই স্থির করেছিলো যে কোনোদিন কারো মুখাপেক্ষী হয়ে বাঁচবে না তাই চাকরির বাজার মন্দা দেখে এই রাস্তা বাছে ।

অপরূপা না হলেও সোহিনীর মুখটা ল্যাপাপোছার মধ্যে মিষ্টত্বে ভরপুর ছিলো । পানপাতার মতন মুখের গড়ণ আর পাকা গমের মতন রং তাই বুঝি নন -গ্র্যাজুয়েট হওয়া সত্ত্বেও ওর বিয়ে হয়ে গেলো মাত্র ২১বছর বয়সে এক প্রবাসের চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেটের সাথে । পারিবারিক যোগ ছিলো ।

সোহিনীর বাবা এক সফল সি-এ আর ওর মা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী । কাজেই অসুবিধে হয়নি । ত্রিপুরার গ্রামে ওদের আদিবাড়ি ।

বিয়ের পরে বিদেশে এসে কম্পিউটার সংক্রান্ত ডিগ্রী বাড়ায় । কিন্তু ওর স্বামী ওকে, বিদেশের নাগরিকত্ব নিতে প্রথমে চাপ দেয় এবং স্বাধীনচেতা মেয়েটি রাজি না হলে দৈহিক অত্যাচার শুরু করে । মদ্যপ স্বামীর অত্যাচার ও সন্তান না হওয়া নিয়ে গঞ্জনা সইতে না পেরে ও বিচ্ছেদের দিকে চলে যায় । বাবা ও মায়ের পূর্ণ সমর্থন নিয়েই বিচ্ছেদ হয় ।

ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে বি-এ পাশ করে সোহিনী এখন কাজ করে এক সংস্থায়, সিস্টেম ম্যানেজার হিসেবে । অনেক মাইনে পায় । দেখতে ভালো তাই ডেটিং এর আহ্বানও আসে অনেক ।

বহুদিন অবধি ও চুপ করেই ছিলো । কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতো । ইদানিং- এক অর্ফানেজ থেকে নয় এক বান্ধবীর সন্তানকে দত্তক নিয়েছে ও । সেই বান্ধবী আবার উড়নচন্ডী স্বভাবের ।

তার মোট পাঁচটি সন্তান । দুইজোড়া যমজ । একজনকে সোহিনী দত্তক নিয়েছে । চারজন মানে যমজ জোড়া দুটি বাবা ও মায়ের

সাথে থাকে । একদম ছোটটিকে কোলে তুলে নিয়েছে সোহিনী দেববর্মা । ওর বান্ধবীরা ভিয়েৎনামী মানুষ । কাজেই শিশুটিকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে সে ওর নিজ সন্তান নয় ।

ওরই মতন ল্যাপাপোছা চেহারা তার । ক্ষুদে চোখ আর হলুদ বরণ ।

ওর স্বামী ছিলো বাঙালি । সৈকত বসুরায়চৌধুরী । সে বিদেশে এখন নিজ **সি-এ ফার্ম** খুলেছে । আর বিয়ে করেনি । কোনো গার্লফ্রেন্ড আছে বলেও শোনেনি কমন ফ্রেন্ডের মাধ্যমে ।

সোহিনী সম্প্রতি ডেট করছে এক গায়ককে । নামী কেউ নয় । নানান ফাংশান ও ফিউনেরাল ইত্যাদিতে গান করে । লোকাল রেডিও আর্টিস্ট । নাম ডেনিস্ রোজ । লোকটি, আগে ড্রাগসের কবলে পড়ে অনেকদিন রিহ্যাবে ছিলো । তখন এক সহচরীকে বিয়ে করে । পরে আলাদা হয়ে যায় । এখন সন্তানসহ সোহিনীকে নিয়ে আছে । শিশুটিকে নিজের সন্তানের মতন খাওয়ায় , ন্যাপি বদলায় ইত্যাদি ।

ডাইভোর্স হলেই ওরা বিয়ে করবে এমন ঠিক করেছে ।

ছুটিছাটায় এদিকে সেদিকে ঘুরতে যায় ।

বর্তমানে ডেনিস্ রোজ এক লোকাল হাসপাতালে আছে । কারণ ভূটিয়া গোলাপবাগের সুবাস নিতে গিয়ে আক্রান্ত হয় এক অপরিচিত মানুষের হাতে । তার মুখে ; টেবিল থেকে একটি ছুরি তুলে ঢুকিয়ে দেয় সেই অদ্ভুত লোকটি ।

আগেও এরকম ঘটনা ঘটেছে । যার জন্য সোহিনী কাউকে ডেট করেনি বহুদিন ।

পুলিশের মনে হচ্ছে যে নিজের প্রাক্তন স্ত্রী সোহিনীকে, অন্যের বাহুবন্ধনে দেখে সহ্য করতে না পেরে এগুলো করছে সৈকত । তা নাহলে কেন করবে? হিংসাই একমাত্র কারণ ।

সৈকত তো সাইকো নয় ! কাজ করে খায় । এমনিতে নর্মাল । কিন্তু সোহিনীকে কারো সাথে দেখলেই ওর মাথা গরম হয়ে যায় । ও ভুলে গেছে যে সোহিনী ওর স্ত্রী নেই আর ।

পুলিশ ওকে ওয়ার্নিং দিয়েছিলো । তবুও আবার একই কান্ড ঘটালো ।

যখন একসাথে ছিলো -তখন না রাতে বাড়ি ফিরতো, না বৌকে সময় দিতো । খালি কাজ আর মদ । একটা কোর্টের নির্দেশ হঠাৎ করে কেমন সব বদলে দিয়েছে দেখে হতবাক্ সোহিনী ।

এমন প্রেম আগে দেখালে বিচ্ছেদটাই হতনা যে ।

ডল হাউজ

ওলিম্ দেশের মধ্যেই আছে শহর ফারলং । রাজধানী তাতারি থেকে মাত্র ৩৫ কিলোমিটার দূরে এই শহর । শহরের একদম শেষপ্রান্তে আছে হাল্কা রাবার বন । সেই বনের শেষে একটি বিরাট মহল । লোকে বলে ডল হাউজ ।

আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে এই এলাকার রাজা , এক রাখালের সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো ।

মেয়েটি সুরূপা , সরল ও কর্মঠ । সারাদিন ভ্যাড়া চড়িয়ে সায়াহ্নে ওদের একজোট করে ঘরে ফিরতো । দিনের বেলায় গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় বসে বসে মেয়েটি, সুরেলা একটি যন্ত্র বাজাতো ।

রাজকুমার অনেকদিন ধরে ওকে দেখছে । মনে একটা কোমল ভাব ছড়ায় ওকে দেখলে । মেয়েটি গ্রামীণ ও দরিদ্র হলেও কিছু একটা ছিলো ওর ব্যাক্তিত্বে । একবার রাজকুমার ইচ্ছে করে নিজের হাত কেটে ওর সামনে যায় । ও দৌড়ে এসে নিজের পোশাকের কোণা দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দেয় । তার আগে লতাপাতা ঘষে দেয় । বলে ওঠে :: তোমাকে দেখে মনে হয় শহরের লোক । এইভাবে বনবাদারে ঘোরা তোমার কম্মো নয় ।

বরং ঘরে বসে আরাম করো । তোমার তো পয়সা আছে , আমার মতন সারাদিন বসে বসে পশুর খেয়াল রাখতে হয়না ।

ক্ষুদ্র রাজবংশ হলেও আভিজাত্য ও মান মর্যাদার কারণে এই মেয়ে যার নাম - বার্চ , তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে অক্ষম ছিলো রাজনন্দন । মানুষটি আর বিয়েই করলো না । বার্চের মতন সরল মেয়ে যে ওকে ভালোবাসবে আর ওর দেখভাল করবে তাকেই ওর চাই । কিন্তু বাস্তবজগতে দ্বিতীয় বার্চের সন্ধান পাওয়া গেলোনা । **তখন তো ফেসবুক ছিলোনা কাজেই বার্চ , বৃক্ষ হয়েই থেকে গেলো । রাণী হবার সুযোগ পেলোনা ।**

এরপর নাকি রাজকুমারের কিঞ্চিৎ মস্তিস্ক বিকৃতি দেখা দেয় ।

সারাটাদিন পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতো । যেখানে বার্চ ভ্যাড়া চড়াতো সেখানে । ইদানিং ওর রাখাল পিতা এই কাজ করতো । বার্চকে ওর বাবা ও মা ঘরবন্দী করে রেখেছিলো ও অন্য পাত্রের সন্ধান করছিলো রাজবাড়ির নির্দেশ অনুযায়ী !

বার্চের বল্কল পাবার আশায়, বনপথে ঘুরতো পাহাড়িয়া রাজকুমার । শেষে ঘরে বসে পুতুল সংগ্রহ করতো ।

নানান দেশের অপরূপ পুতুল সব । পুরুষ পুতুলগুলো ক্লায়েন্ট আর পুত্লি মানে মেয়ে পুতুলগুলো দেহপসারিনী । এইভাবে দিনরাত বসে বসে মানুষটি পুতুল খেলতো ।

শেষ অঙ্কে মেয়ে পুতুলগুলোকে টেনে , হিঁচড়ে খুলে ফেলতো । হাসতো , হা হা হা করে । মহল কাঁপিয়ে ।

বলতো, দেখো অভিজাত মেয়েদের নমুনা । তবুও সহজ সরল মেয়েদের তোমরা বৌ করবে না ।

বছর পাঁচেক বাদে ওকে শিকল বেঁধে রাখতে হত ।

শেষে আত্মহত্যা করে ।

রাজ পরিবার পরে ঐ বাড়িটাকে ডল হাউজ করে দেয় । সেখানে সব পুতুল সাজানো আছে । অরিজিন্যাল ডল আর তার সাথে কুমারের ছিঁড়ে ফেলা ডলের টুকরোগুলো ।

জিঘাংসা, এইকথাটাই মনে হয় ডল হাউজ দেখলে ।

-----ভাগ্য ভালো যে জ্যান্ত পুতুলের ওপরে কোপ পড়েনি । অনেক টুরিস্টই ডল হাউজের কমেন্ট পত্রে লিখে রেখে গেছে ।

সূর্যের আলো নেভার আগেই ডল হাউজ খালি হয়ে যায় ।
সমস্ত টুরিস্টকে বার করে দেওয়া হয় । তারপর সারাটা রাত চলে তান্ডব নৃত্য । পুতুলগুলো নাকি হাসে, কথা বলে , চলাফেরা করে ।
ওদের গণিকাবৃত্তিতে লাগিয়েছিলো রাজকুমার কিন্তু ওরা সরল পুতুলের দল সেজন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে রাতভর অশ্রু বৃষ্টি নামায় ।

পরদিন ভোরে পুরো ডল হাউজ অগোছালো হয়ে থাকে । আবার কেউ আসে , এসে সব গুছিয়ে তোলে টুরিস্ট আসার আগেই ।

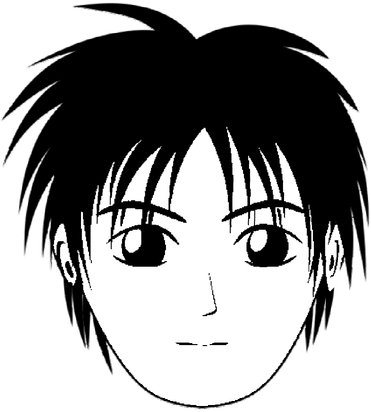

মোহানায়

দীর্ঘদিন ইংল্যান্ডে কাজ করা চিকিৎসক মোহন ভার্গব স্থির করে যে জীবনের শেষপ্রান্তে মাতৃভূমে গিয়ে কাজ করবে ।

কিছুটা ঋণ শোধ কিছুটা নিজস্ব ভালোলাগা ।

অনলাইন বিজ্ঞাপন দেখে খুঁজে বার করলো একটি হাসপাতাল । সেখানে অভিজ্ঞ ডাক্তারের প্রয়োজন । সরকারি হাসপাতাল ।

হিমালয়ের গহীন বনে এই হাসপাতাল । বৌদ্ধ্য গুম্ফা থেকে ক্রমে ক্রমে ভেসে আসে সুন্দর ঘন্টার আওয়াজ আর সংগীত।

সবুজ বনপথ বেয়ে , মঠের গা ঘেঁষে এই হাসপাতাল ।

দিল্লী হয়ে আসে মোহন । হয়ত রিমোট জায়গা বলে চিকিৎসক পায়না সরকার । কেউ এলেও বেশিদিন থাকেনা ।

সুন্দর প্রকৃতি আর শীতল আবহাওয়া হলেও অনেকেই লোকলস্কর , মেজাজি আড্ডা পছন্দ করে তাই হয়ত চিকিৎসকেরা পালিয়ে যায় । মোহনের সেই সমস্যা নেই । বিদেশে সে একাই দিন কাটাতো আর এখন এত বয়স হয়ে গেছে যে আর লোকজন ভালোলাগেনা । একাই বেশ থাকে ।

চিরটাকাল অসম্ভব ব্যস্তজীবন কাটানো এই ডাক্তার এখন সাপলুডো খেলে আর ইন্সটাগ্রামিং করে করে দিন কাটায় । এই পাহাড়িয়া রাজ্যের ফটো তুলে সোসাল মিডিয়ায় পোস্ট করে । সম্প্রতি যা নিয়ে কলকাতায় এক প্রদর্শনী হয়েছে ।

মাঝে মাঝে ট্রেক করতে বেরিয়ে পড়ে ।

গরম চায়ের সুবাস আর কড়কড়ে টোস্ট খেয়ে শুরু হয় পথচলা । শেষ হয় লোকাল কোনো লোকের বাড়ি ।

এই এলাকায় মানুষ সবজায়গায় পায়ে হেঁটে হেঁটে যায় । শিশু, কিশোর থেকে শুরু করে বৃদ্ধরা অবধি । এখানে মানুষের গড় আয়ু ১২০ বছর । ৬০ বছরের পরেও লোকে মা হয় । এবং ক্যান্সার ও এইডস্ নেই এই এলাকায় ।

শুদ্ধ বাতাস আর অঢেল, সতেজ খাদ্যকণা ও সবজির কারণে রোগভোগ নেই । খাঁটি দুধ খায় লোকে । সবাই নিরামিষ খায় । অনেক ফল খায় । কোনো কেমিক্যালের ব্যাপার নেই । **হিমবাহের জলে স্নান ও সেই জলপান , স্ট্রেস ফ্রি হয়ে হাসি হাসি মুখ করে থাকা সবসময় ঠিক যেন আদিম কোনো রাজ্য !**

আর মেয়েরা অপরূপা । কোথায় লাগে মিস্ বা মিসেস্ ইউনিভার্স ! বৃদ্ধদের চামড়াও মসৃণ , কোনো ক্রিম ছাড়াই । আপেল গাল আর স্ট্রবেরি রাঙা ঠোঁট !

এত স্বাস্থ্যকর জায়গা বলেই বুঝি কোনো চিকিৎসকের দরকার হয়না । তাই ডাক্তারেরা সহজেই বোর হয়ে যায় । কাজের অভাবে । পালিয়েই যায় শেষমেশ ।

পালানোর কারণটা মোহন ; মোহনায় এসেই বুঝেছে ।

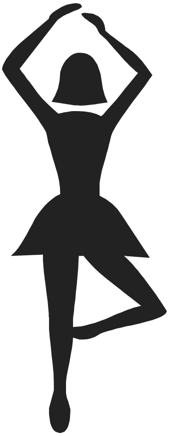

Information ::

The Hunza people live till 120, give birth at 65 and laugh a lot!

The members of the Hunza Communtity, consisting of 87,000 people live in the mountains of northern Pakistan with an average life-span of about 120 years. In some rare cases they even live until the age of 160, often without experiencing problems for the first 120 years. In fact, Said Abdul Mobudu, a member of the Hunza community confused immigration officers in London a few years ago because his passport stated his birth year as 1832.

The history of these people is even more fascinating. The Hunzas claim to be the descendants of Alexander the Great. Their community came into being at the time of the conquest, as they settled into the village and consequently married among themselves.

http://www.australiannationalreview.com/hunza-people-live-120-give-birth-65-laugh-lot/

হাফ্ -ফিউনেরাল

প্রেমের শেষকৃত্য হয় আগে জানতাম না । আমরা ভারতের লোকেরা অনেক কিছুই জানিনা , বুঝিনা । শিখি আর তারপর আত্মস্থ করি । এরমকই এক ঘটনা ঘটলো আমার জীবনে । পড়শী পেগি জন্সটন্ খুবই দয়ালু । আমার অপারেশনের সময় আমার স্বামীকে ডিনার রান্না করে দিয়েছে । ওদের দুই সন্তান আমার স্বামী প্রতীককে সঙ্গ দিয়েছে । শিশু সঙ্গ মানে সরলতা , স্ট্রেস ফ্রি হওয়া ।

সেই পেগিই ওর প্রেমের শেষকৃত্য করছে । প্রেমকে কবর দেবে । কারণ ওর পার্টনার মানে সাথী ওকে ফেলে চলে গেছে । অন্য মহিলার বাহুবন্ধনে । সেই প্রেমিকা খুবই ধনী । তাই পেগির সাথী, খুব কম বয়সেই অবসর নিতে সক্ষম হবে , চাকরি থেকে আর লাইফকে এনজয় করবে তারপরে । পেগি Canopy research করে তাই ওর বেশি পয়সা নেই । রোজগার কম ।

আর ওর পার্টনার একটু হুজুগে আর খরুচে । তাই ওকে ছেড়ে চলে গেছে নতুন বৌ লিরিলের কাছে । লিরিল একটি ক্যাসিনো চালায় যার অনেক শাখাপ্রশাখা । ওর নাকি এত পয়সা যে ও নিজেও তার হিসেব রাখতে পারেনা।**একটা হাত অর্ধেক আছে সেই জাদুকরী মেয়েটির !**

পেগির প্রাক্তন প্রেমিকের মতন লোকেদের এখানে শ্যালো লোক বলা হয় । গভীরতা কম আরকি ! সমাজে অঢেল ছাড় কিন্তু মানবিকতার ব্যাপারও থাকে । তাই ওরা গভীরতাকে আঁকড়ে থাকে । **ওদের রক্ষাকবচ এটাই । গভীরতাই ওদের সমাজকে জীবিত রেখেছে !**

হয়ত কোনো কারণে জাদুকরীর হাফ্ হাত কাটা পড়েছে । তাতে কি ? জীবনটাকে আমরা টানটান করে রাখতে ইচ্ছুক কিন্তু বাস্তবে তো তা হবার নয় তাই এখানে সেখানে কুঁচকে যায় নিয়ম করেই- আর আমরা সেই কুঞ্চিত অংশ ইস্ত্রি করতে সদাব্যস্ত ।

হাতের সাথে বিয়ের সোজাসুজি তো কোনো সম্পর্ক নেই বিশেষ করে বিদেশের মতন প্রযুক্তিগত সুবিধার দেশে ! কথায় বলে পূর্ব দিয়েছে দর্শন আর পশ্চিম, প্রযুক্তি।

কাজেই পেগি ওর হাফ মৃত্যু মানে প্রেমের অর্ধ ফিউনেরাল করছে ।

ব্যান্ড বাজিয়ে দু:খের গান শোনালো লোকেরা । পেগিকে কালো পোশাকে মানে মৃত্যুর পোশাকে সাজানো হল । আর সিম্প্যাথি খাদ্যে সজ্জিত ছিলো টেবিল । ডিমের ওমলেট্ ,পালং আর চিকেনের স্যালাড্, হরেক রকমের **ফিউনেরাল আলুর ডিশ** আর নানান স্যুপের কারিকুরি । শেষে ব্রাউন কেক আর চকোলেট পুডিং।

মন্দ নয় ; হাফ্ সরি ফুল গার্লফ্রেন্ড দ্বারা কৃত, হারানো প্রেমের হাফ্ ফিউনেরাল ।

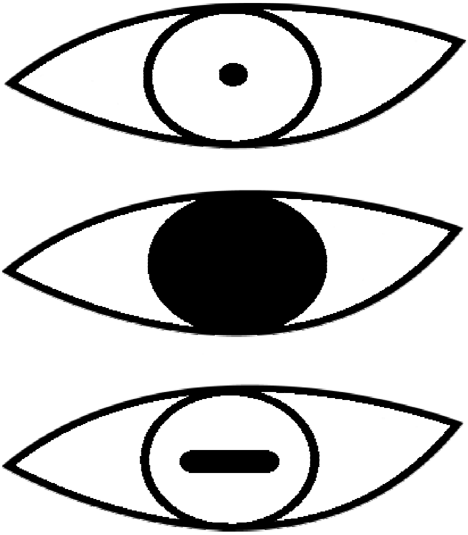

শিখর

একটি বড় বাগান আছে শিখর লোধের বাড়ি । আসলে ভদ্রলোক বিয়ে, অন্নপ্রাশন ইত্যাদির সময় ডেকোরেটরের কাজ করেন । তাই নিজের বাগানটা অপরূপ ভাবে সাজিয়ে রেখেছেন ।

লোকে দেখতে যায় ।

শিখর নানান রাজ্য ঘুরে ; নতুন নতুন ডেকোরেশানের আইডিয়া নিয়ে বিয়ে বাড়ি সাজান । বাঙালী আল্পনার বদলে রঙ্গোলি, দক্ষিণীদের পুষ্পসজ্জা , রাজস্থানি ও গুজরাটি মানুষের নানান সজ্জার সমস্ত নজির পাওয়া যায় ওর ডেকোরেশানে ।

শকুন্তলা হাবিবের , ওর বাড়ি যাবার কারণও এটাই । কোথায় শিখলেন এইসব ??

ভদ্রলোক জানালেন যে উনি পড়েছেন অঙ্ক নিয়ে । অঙ্ককে আর্টস্, সায়েন্স কিংবা কমার্স কোনোটাই বলা যায়না ।

সবকিছুতেই অঙ্ক লাগে । রোজাকার টাকার হিসেব , জিনিস গোনা সবই অঙ্ক । ইতিহাসে সালের হিসেব , অর্থনীতিতে অঙ্ক এবং কম্পিউটার গ্রাফিক্স হল অঙ্ক দিয়ে সৃষ্ট শিল্প ।

কাজেই নিজেকে উনি অঙ্কপাগলা মানুষ বলেন ।

ওঁর জীবন জলছবি চমকপ্রদ !

অঙ্ক নিয়ে পড়ার পরে লোন শোধের জন্য, লটারির টিকিট কিনতেন । মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষই বেশি এগুলি কেনে ভাগ্যের আশায় । তখন উনি একটি ফর্মুলা আবিষ্কার করেন যা দিয়ে খেললে টিকিটের নম্বর মিলে যাবে ।

এই লটারি নিয়ে ; মানুষকে শেখানোর জন্য একটি ট্রেনিং সংস্থা শুরু করেন । অনেক মানুষ লটারি পেয়েও যায় ।

পরে বিক্রি করে দেন ।

সেই টাকা দিয়ে কিছুদিন আনন্দ ফূর্তি করে কাটান নিজের গ্রামে । সেখানেও চমক । গ্রামের গহীন বনে নাকি পূর্ণিমা রাতে কে ঘুঙুর পরে ঘোরে তাই লোকে ঐপথে যাওয়া বন্ধই করে দেয় ।

আসলে ঘুঙুর পরে ঘোরে এক গ্রামীণ মেয়েই । তবে সে মানুষ । প্রেতাত্মা নয় । **সেটা বার করেন শিখর লোধ !**

সন্দেহ আগেই হয় । পরে বুদ্ধি করে একটি অসম্ভব পাওয়ারফুল চুম্বক নিয়ে উনিও গহীন বনের ধারে , প্রেতের গতিপথের কাছে

লুকিয়ে ফিক্স করে আসেন । প্রচন্ড শক্তিমান এই চুম্বক নিমেষে সেই ঘুঙুর টেনে নেয় । চুম্বকে পা আটকে চিৎকার করতে শুরু করে মানুষী দেবী খান । **নাম - দেবী হলেও সে কুকর্ম চক্রের সাথে জড়িত ছিলো । ওর স্বামী খানসাহেব , সেই চক্রের পান্ডা। স্মাগলিং এর চক্রে ওরা জড়িয়ে ।**

বর্ডার পার করে, বিদেশী জিনিস এনে দুনম্বরী উপায়ে বিক্রি করতো ওরা । রাতেই কাজ বাড়তো । হয়ত পূর্ণিমা বলে কম আলোতে কাজ হয়ে যেতো , জ্বালানির খরচ বেচে যেতো ।

লোকেও ভয়াল ভূমি ভেবে সবসময় এড়িয়ে চলতো । পুর্ণিমা কেন অমাবস্যাতেও । মাসের প্রতিটি দিনই ।

শিখর লোধের বুদ্ধির তারিফ না করে পারেনা শকুন্তলা হাবিব ---তাই মিষ্টি হেসে বলে ওঠে , আপনি কেবল আর্টস মানে ফুলে বা ডেকোরেশানে নন আছেন কর্মাস ও লজিকেও !

সার্থক আপনার অঙ্ক শিক্ষা । সত্যি, আপনিই হলেন উপযুক্ত অঙ্কপাগলা শিল্পী ব্যবসাদার ! তাই সবকিছুর শিখর কেবল

আপনার মতন নম্বর ওয়ান মানুষদেরই জন্য !

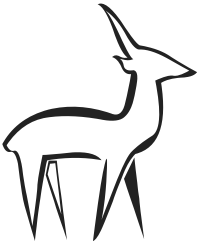

The End